দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

জঙ্গি হামাসের বিরুদ্ধে ভারতের বুদ্ধিজীবীরা শীতঘুমে— পৃঃ ২৮

শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে যে কোনো সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রতিবাদ করতে হবে — পৃঃ ১১

৭৬ বর্ষ, ৯ সংখ্যা।। ২০ নভেম্বর, ২০২৩।। ৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধ
ভবিষ্যৎ কী ?

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২০ নভেম্বর - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

'অভিষেক ধ্বংস তৃণমূল তত্ত্ব : সে তত্ত্বে ফেঁসে মমতা' পায়রার খোপে কালো বেড়াল ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

আদালত ও একটি দিদি ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

সাপ্তাহিক ৭০ ঘণ্টার কর্মকাল প্রসঙ্গে এন.আর নারায়ণমূর্তি ☐ আর জগন্নাথন ☐ ৮

ভারতমাতা কী জয় ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে যে কোনো সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রতিবাদ করতে হবে ☐ আনন্দ মোহন দাস ☐ ১১

সংরক্ষণ বঞ্চিত বাঙ্গালিকে টানতে চাইছে জাতপাত ভিত্তিক জনগণনায় ☐ সুদীপ্ত গুহ ☐ ১৩

পশ্চিমবঙ্গে প্রবহমান দুর্দম দুর্নীতি ☐ খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ☐ ১৬

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভারতের জাতীয় জাগরণ ☐ অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য ☐ ১৮

হামাস নামক জল্লাদের হামলা ☐ সুবল সরদার ☐ ২৩

ইউরোপের উদ্বাস্তু সমস্যা এবং হামাস-আক্রমণ মুসলমান-বিদ্বেষ বৃদ্ধির অনুঘটক ☐ মৃণাল মজুমদার ☐ ২৪

হামাসের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের কঠোর প্রত্যাঘাত সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার লড়াই ☐ সাধন কুমার পাল ☐ ২৬

জঙ্গি হামাসের বিরুদ্ধে ভারতের বুদ্ধিজীবীরা শীতঘুমে ☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ২৮

জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী ☐ গোপাল চক্রবর্তী ☐ ৩১

ছটপূজায় জলাশয়ে সূর্য উপাসনা আচার কেন্দ্রিকতা ভিন্ন আর কী কারণ? ☐ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী এবং অরিত্র ঘোষ দস্তিদার ☐ ৩৩

কার্তিক মাসের মাহাত্ম্য ☐ কানু রঞ্জন দেবনাথ ☐ ৩৪

ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দেন সরাইঘাটের সেনানায়ক ☐ দুর্গাপদ ঘোষ ☐ ৪৩

প্যালেস্তাইন-ইজরায়েল সঙ্ঘাতের মূলে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ☐ সুব্রত মণ্ডল ☐ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ৩৬-৩৮ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৫০

প্রকাশিত হবে ২৭ নভেম্বর, ২০২৩

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৭ নভেম্বর, ২০২৩

আগামী সংখ্যার বিষয়— গুরু নানকদেব।

ভারতবর্ষের বীর সন্তান যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে এই দেশকে সমৃদ্ধ করেছেন। সমাজ সংস্কারের মতো ধর্ম সংস্কারকও আবির্ভূত হয়েছেন এই দেশে। ভারতের পশ্চিমাংশে পঞ্জাব প্রদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন এমনই একজন— গুরু নানাকদেব। তিনিই শিখ পন্থের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষের সংস্কৃতিক অখণ্ডতা রক্ষায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী, পিণ্টু সান্যাল, রবিরঞ্জন সেন প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কাহারা সন্ত্রাসের পক্ষে?

বিশ্বের সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে সন্ত্রাসবাদ মানবতার সবচাইতে বড়ো শত্রু। ইহা কত সভ্যতা ও সংস্কৃতি চিরতরে বিনষ্ট ও বিলুপ্ত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যুদ্ধপিপাসু কয়েকটি জাতি কেবল সন্ত্রাসকে আশ্রয় করিয়াই বহু দেশ দখল করিয়াছে। দখল করিয়া শুধুমাত্র শাসন কায়েম করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত থাকেনি, বিজিত দেশটির সভ্যতা, সংস্কৃতি সব কিছু ধ্বংস করিয়া নিজেদের মত ও মজহবও চাপাইয়া দিয়াছে। এইভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী তাহারা সন্ত্রাসের শাসন কায়েম রাখিয়াছে। ভারতবর্ষ ইহার সবচাইতে বড়ো ভুক্তভোগী। ভারতবর্ষের বুকে শক, হুন, গ্রিক, পাঠান, মুঘলরা আক্রমণ হানিয়া শুধু প্রাণহানিই করে নাই, এই দেশের শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দু— মঠ, মন্দির, দেববিগ্রহ চূর্ণ করিয়াছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়াছে, নারীজাতির অবমাননা ও লাঞ্ছনা করিয়াছে, এই দেশের মানুষকে জবরদস্তি ধর্মান্তর করিয়াছে। তাহাতেও কিন্তু ভারতবর্ষ অবদমিত হয় নাই। ভীত ও লোভীরা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে কিন্তু স্বাভিমানী ভারতসন্তানরা সতত মরণপণ সংগ্রাম করিয়াছেন। দেশ পরাধীন হইলেও তাহাদের রাষ্ট্রবোধ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দীর্ঘ সংগ্রামে এক সময় দেশ পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু সন্ত্রাসমুক্ত হয় নাই। স্বাধীন ভারতও বারবার সন্ত্রাস কবলিত হইয়াছে, রক্তরঞ্জিত হইয়াছে। দুর্বল শাসননীতির কারণে স্বাধীনতার পর বহু বৎসর যাবৎ সন্ত্রাসীরা এই দেশে সন্ত্রাস কায়েম রাখিয়াছে। স্বাধীন ভারতে জেহাদি সন্ত্রাসে কাশ্মীর উপত্যকা রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে। শত শত মাতা-ভগ্নীর সম্ভ্রমহানি ঘটিয়াছে। কাশ্মীরি পণ্ডিতদিগকে নিজভূমে পরবাসী হইতে হইয়াছে। মুম্বই-সহ দেশের বহু স্থানে তাহারা সন্ত্রাস চালাইয়াছে। দেশের দুর্বল শাসননীতি দেশ অথবা বিশ্বমঞ্চে কোথাও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করিতে পারে নাই। ২০১৪ সাল হইতে বলিষ্ঠ শাসননীতির কারণে বিশ্ব জুড়িয়া প্রবল প্রতিবাদ সংগঠিত হইয়াছে। বর্তমান ভারত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করিয়াছে। বিশ্বের বহু দেশ তাহাতে সমর্থনও জানাইয়াছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বর্তমান ভারত বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে শুরু করিয়াছে। দুই-একটি দেশ ব্যতীত সমগ্র বিশ্ব ভারতের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছে।

সম্প্রতি ভারতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধ জোর সওয়াল করিয়াছেন। সন্ত্রাসের দোসর কয়েকটি দেশ সহমত না হইলেও সকলেই ঐকমত্যে আসিয়াছে। ওই দুই-একটি দেশ বরাবর সন্ত্রাসের পক্ষে রহিয়াছে এবং সহযোগিতা করিয়াছে। বিশ্বমঞ্চে তাহারা অবশ্য একঘরেও হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল, বিশ্বমঞ্চে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত হইলেও ভারতেরই অধিকাংশ বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা সন্ত্রাসের পক্ষেই সওয়াল করিতেছেন। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন ঐতিহাসিকেরা ভারতবর্ষের বুকে পাঠান-মুঘলের সন্ত্রাসকে সম্পূর্ণ হোয়াইট ওয়াশ করিয়া তাহাকে তাহাদের সুশাসন বলিয়া ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাশ্মীরের বুকে নিরবচ্ছিন্ন সন্ত্রাসকে তাঁহারা সন্ত্রাসবাদীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অবশ্য কারণ রহিয়াছে। সন্ত্রাসীদের তাহারা নির্বাচনী লড়াইয়ে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাই তাহারা দেশে হউক, বিদেশে হউক সন্ত্রাসের পক্ষেই কথা বলিয়া থাকেন। সম্প্রতি ইজরায়েলের বুকে হামাস জেহাদিদের অতর্কিত নৃশংস আক্রমণে তাহারা নীরব রহিয়াছিলেন। কিন্তু যখনই ইজরায়েল প্রত্যাঘাত করিতে শুরু করিয়াছে, তখনই তাহারা সরব হইয়া উঠিয়াছেন। ইজরায়েলকেই তাহারা আক্রমণকারী হিসাবে প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কমিউনিস্টরা কলকাতার রাজপথে মিটিং মিছিল করিয়া জেহাদি হামাসের দুর্গতির জন্য অশ্রুবর্ষণ করিয়া ইজরায়েলের মুণ্ডপাত করিতেছে। কংগ্রেসও একইভাবে জেহাদি হামাসের পক্ষে এবং ইজরায়েলের বিপক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে পদযাত্রা করিতেছে। কাশ্মীরে পণ্ডিতদের উপর নৃশংস সন্ত্রাসে তাহারা একটিও কথা ব্যয় করেন না, প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নৃশংস অত্যাচারে তাহারা নীরব থাকেন। তাহাদের এই দ্বিচারিতা দেশের মানুষ ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

ভারতে দুর্বল শাসননীতির অবসান হইয়াছে। ইজরায়েলের উপর হামাস জঙ্গিদের আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিয়া বর্তমান বলিষ্ঠ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইজরায়েলের পার্শ্বে থাকিবার বার্তা দিয়াছেন। ইহা যুদ্ধকে সমর্থন নহে, ইহা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপে সহযোগিতা। বর্তমান ভারত কয়েক বৎসর যাবৎ অন্যান্য বহু চ্যালেঞ্জের সহিত সন্ত্রাসবাদেরও মোকাবিলা করিয়া চলিয়াছে। সন্ত্রাস যেইখানেই ঘটুক না কেন, তাহা ঘোর মানবতা বিরোধী। এই সত্য ভারতের বর্তমান নেতৃত্ব অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন। ভারতের রাজনৈতিক বিরোধী এবং লেফট-লিবারালরা যতই সন্ত্রাসবাদের পক্ষে সোচ্চার হউন না কেন, দেশের মানুষ তাহাদের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন।

সুভাষিতম্

অর্থানর্থৌ বিনিশ্চিত্য ব্যবসায়ং ভজেত হি।
গুণতঃ সংগ্রহং কুর্যাদ্ দোষতস্তু বিসর্জয়েৎ।।

কোনো কাজ শুরু করার আগে সেই কাজের সম্ভাব্য লাভ-লোকসানের বিষয়ে দীর্ঘ চিন্তাভাবনা করেই সেই কাজের গুরুত্ব অনুসারে তা শুরু করা অথবা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

‘অভিষেক ধ্বংস তৃণমূল তত্ত্ব : সে তত্ত্বে ফেঁসে মমতা’

পায়রার খোপে কালো বেড়াল

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

একে একে নিভিছে দেউটি। কারণ নাকি অভিষেক। ‘অভিষেক নিধন চাই’, তাই বৃদ্ধ তৃণমূলের নতুন নিদান। তৃণমূলের বার্ধক্য আবাস থেকে সে ‘আজান’ (ডাক) দেওয়া হয়েছে। ঘুষেঘুষে আর ঘষেঘষে। মমতার কানে সে আওয়াজ পৌঁছেছে অনেক আগেই। অভিষেক বধে বিরোধীদের নতুন জায়গা নিয়েছে বৃদ্ধ তৃণমূল। তাই খানিকটা বাধ্য হয়েই গা ছাড়া দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য বা দল নিয়ন্ত্রণে তার বাসনা ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে।

১৯৫৫ (সরকারি ১৯৫৬) সালে জন্ম মমতার। এখন সত্তরের দোরগোড়ায় মমতা। কোনোমতে পালিয়ে বাঁচতে চাইছেন। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচির দশা। চাপের কারণ অবশ্যই ভাইপো। উঠতি নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তদন্তকারী সংস্থা তাঁকে ছ'বার জেরা করেছে। তিনি দুর্নীতিপরায়ণ নন সে সাফাই গাইতে ৬ হাজার পাতার নথি জমা দিয়েছেন। দলের সর্বময় নেতা নিজেকে বাঁচাতে যদি ওই পর্বতপ্রমাণ নথি জমা দেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে সে দলের দুর্নীতি কত গভীরে। নেতার যদি এই অবস্থা হয় তাহলে দলের আবোলতাবোল কচি খুদেদের কী অবস্থা হতে পারে! পার্থ চট্টোপাধ্যায় দিয়ে যে দুর্নীতির শুরু অভিষেকের শাস্তি দিয়ে হয়তো বা তার শেষ।

সেই শেষেরও শেষ মাথায় রয়েছেন মমতা। অবাক হব না যদি সেই শেষ মাথায় তদন্ত পৌঁছয়। আর এটা দিবাস্বপ্ন নয়। কাউকে খুশি করা সাংবাদিকের কাজ নয়। তথ্যের ভিত্তিতে জনমানসে ভবিতব্য এঁকে দেওয়াই তাদের কাজ। আগেও বলেছি আবার বলছি, ২০২৬ সালের পর এ রাজ্যের ভবিতব্য বিজেপি-র একচ্ছত্র শাসন। মমতার মেয়াদ যে ফুরিয়ে আসছে কেউ না মানলেও মমতা মানেন। তাই নিজের, দলের আর পরিবারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার শেষ লড়াই চালাচ্ছেন।

তৃণমূল রাজনৈতিক দল নয়। পারিবারিক দল। জাতীয় কংগ্রেসের মতো। পরিবারেই উদ্ভব। পরিবারেই শেষ। স্বাধীনতা-পূর্ব শেষ দশ বছর মোহনদাস গান্ধীর নাগালের বাইরে ছিল জাতীয় কংগ্রেস। সর্দার প্যাটেল, নেহরু আর আজাদ-দের করায়ত্ত ছিল দল। গান্ধী ছিলেন ‘ঠুঁটো জগন্নাথ’ (প্রবচন)। মমতার সেই দশা। নাগালের বাইরে রয়েছে অনেক কিছু। মমতার বৃদ্ধ পায়রার আবাসে হানা দিয়েছে অভিষেকের কালো বেড়াল। যে হারে মমতার সেনানীরা চোর সাব্যস্ত হচ্ছেন তা থেকে এটা স্পষ্ট এই চোর ধরা ২০২৪-এর লোকসভা ভোট পর্যন্ত চলবে। মমতা জানিয়ে রেখেছেন তাঁর কাছে খবর এর মধ্যেই অভিষেককে ধরা হবে। পার্থ, অনুব্রত আর জ্যোতিপ্রিয়দের তালিকায় হয়তো- বা শীঘ্রই নাম জুড়বে ফিরহাদ (ববি) হাকিম আর মলয় ঘটকের। হাকিম ইঙ্গিতে জানিয়ে রেখেছেন মমতা তার নেত্রী, অভিষেক নয়। মমতার চোরেরা যত ধরা পড়বে, অভিষেক শিবির তত বেশি হর্ষোল্লাস, উৎসব, মোচ্ছব আর গ্র্যান্ড পার্টিতে মেতে উঠবে। তাই মমতার বৃদ্ধ শিবিরের শেষ আশা অভিষেকের গ্রেফতারি। তার জেল বা গারদ হওয়া পর্যন্ত নিদ্রাহীন রাত কাটাচ্ছেন তৃণমূলের বৃদ্ধ নেতারা।

> মমতার চোরেরা যত ধরা পড়বে, অভিষেক শিবির তত বেশি হর্ষোল্লাস, উৎসব, মোচ্ছব আর গ্র্যান্ড পার্টিতে মেতে উঠবে। তাই মমতার বৃদ্ধ শিবিরের শেষ আশা অভিষেকের গ্রেফতারি।

মমতার ছুঁচো গেলার অবস্থা। বেচারি! ইডি বা সিবিআই-এর হাতে অভিষেকের আটক বা গ্রেফতারি বিরোধীদের চাইতে শতগুণে বেশি প্রয়োজন তৃণমূলের অন্দরে। নিশ্চিত জানি তৃণমূলের কিছু ‘মরা কাঠ’ আর বৃদ্ধ নেতা ‘ভাইপো শ্রীঘরে ঢুকতে চলেছে’ স্বগতোক্তি করে ইতিমধ্যেই জল-মিষ্টি খেয়ে ফেলেছেন। লোকসভা ভোটে নাম কাটা যেতে পারে প্রায় অশীতিপর সৌগত রায় আর কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অনেকের মতে তারা দুর্মুখ। ঘোর অভিষেক বিরোধী। তবে এই অবস্থায়ও নিজের মর্যাদা রক্ষা করে দলে জায়গা রেখেছেন সত্তরোর্ধ সুখেন্দুশেখর রায় (বুলু)। প্রাক্তন কংগ্রেসি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের এই ভাবশিষ্যকে অভিষেক আর মমতা সসম্মানে রাজ্যসভায় স্থান দিয়েছেন তৃতীয়বারের জন্য। অভিষেক জানেন কারা তার বিরোধী। তাদের কাছে অভিষেক আটক সময়ের অপেক্ষা। তারপর পোয়াবারো। ঘরের ছেলের বিরুদ্ধে সে জল্পনা মমতা নিজেই উসকে দিয়েছেন। আর ফেঁসে গিয়েছেন। তাই পালাই পালাই ভাব। নিজের তৈরি ফাঁসির মঞ্চে নিজেই লটকে গিয়েছেন মমতা। হয়েছে বুমেরাং। তাহলে ভাইপো লটকাবেন কবে?

আদালত ও একটি দিদি

আইন-আদালতের দিদি,

আজ ভাইফোঁটা। মনে মনে আপনার শুভকামনা নিয়েই এই চিঠি লিখছি। অবশেষে তিহার জেলে থাকা প্রিয় ভাই কেষ্টকে জেলা সভাপতি পদ থেকে সরিয়েছেন। কিন্তু তাঁর জায়গায় কাউকে নিয়ে আসতে পারেননি। সত্যিই তো কেষ্টদার মতো ভাইয়ের কোনও বিকল্প হয় নাকি! তবে মন খারাপের আরও কারণ রয়েছে। আপনার আর এক প্রাণাধিক প্রিয় ভাই কেষ্টকে জেলা সভাপতি পদ থেকে সরিয়েছেন। কিন্তু তাঁর জায়গায় কাউকে নিয়ে আসতে পারেননি। সত্যিই তো কেষ্টদার মতো ভাইয়ের কোনও বিকল্প হয় নাকি। তবে মন খারাপের আরও কারণ রয়েছে। আপনার আর এক প্রাণাধিক প্রিয় ভাই বালু ওরফে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঠাঁই হয়েছে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের পহেলা বাইশ ওয়ার্ডে। ঠিক পার্থদাদার দু' নম্বর সেলের পাশের সেলেই।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি করেছিলেন যে ভাইকে মানে বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা আগে থেকেই এর ওয়ার্ডে রয়েছেন। সেই ওয়ার্ডের সাত নম্বর সেলের নতুন বাসিন্দা বালুদাদা। এক থেকে বাইশটি একক সেল বা ঘর থাকায় ব্রিটিশ আমলের পরে ওই ওয়ার্ডের নামকরণ হয়েছিল পহেলা বাইশ। এখন ওই ওয়ার্ডকে 'এমএলএ-ব্লক' হিসেবে ডাকতে শুরু করেছেন কারারক্ষীরা। একের পর এক মন্ত্রী ও বিধায়ক সেখানে থাকতে শুরু করার পরে মুখে মুখে বদলেছে পুরনো নাম। ভাইফোঁটার দিনে ওইখানে কি আপনার মনটাও চলে গিয়েছে দিদি! মন কি বলছে, 'যমদুয়ারে পড়ুক কাটা?' দিদির মন তো!

কিন্তু আমি দিদি, চিঠির শিরোনামে 'আদালত ও একটি দিদি' লিখেছি কেন সেটাই বলা হয়নি। আপনার নিশ্চয়ই মনে রয়েছে পরিচালক তপন সিংহ 'আদালত ও একটি মেয়ে' নামে ছবি বানিয়েছিলেন সেই ১৯৮১ সালে। এখন সেই ছবিটার কথা খুব মনে পড়ে গেল। গল্প নয়, নামটার জন্য। আসলে দিদি ইদানীং আইন আদালত আপনাকে একেবারে কোণঠাসা করে দিয়েছে। কোনও মামলাতেই জেতা যাচ্ছে না। রাজ্যের কোষাগারের অবস্থা আপনার মুখেই শুনেছি ভাঁড়ে মা ভবানী। সেখানে কোটি কোটি টাকা আপনার ভাইদের নষ্টামি ঢাকা দিতে খরচ হচ্ছে। আবার ভাইপো, ভাইপো বউ, দাদা, বউদিকে বাঁচাতেও যে কত কোটি খরচ হচ্ছে ফি মাসে কে জানে! হিসাব চাইব না দিদি। সে আমার কাজ নয়। আমি খালি আপনার সঙ্গে দুশ্চিন্তার ভাগী হতে পারি।

শুনলাম এবার আপনি লোকসভা নির্বাচনের মতো করেই আইনি লড়াইয়ের জমি তৈরি করছেন। করতে তো হবেই। সরকারের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগে জেরবার আপনার দল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আদালতের নির্দেশে ওই সব মামলার তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে সঙ্গে আইনজীবীদের সমন্বয়ের অভাবে মুখ পুড়ছে আপনার। দীর্ঘদিন ধরেই সিআইডি-তে একজন আইনি পরামর্শদাতা রয়েছেন। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিআইডিকে আইনি পরামর্শ দিয়ে থাকেন। শুনছি, এবার আপনি এডিজি পদমর্যাদার একটি পদও তৈরি করেছেন। যিনি আইন আদালত দেখবেন।

ক'দিন আগেই তো প্রশাসনের শীর্ষমহল আইনমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি বৈঠক করে। তার পরেই সরকারি আইনজীবী পদে কর্মরত শাশ্বতগোপাল মুখোপাধ্যায়কে সরিয়ে দেবাশিস রায়কে আনা হয়েছে। আবার রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালের কাছে তাঁর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। নতুন কাউকে আনতে হবে। কিশোর দত্তের নাম শোনা যাচ্ছে। তিনি আগেও এই পদ সামলেছেন। কিন্তু পারছেন না বলেই তো সরিয়ে দিয়েছিলেন দিদি। এখন আবার বাধ্য হয়ে আনছেন। কিন্তু আপনার ভাইয়েরা আপনার নাম করে যা যা সব করে রেখেছে তা থেকে বাঁচানোর সাধ্য কি আইনজীবীদের রয়েছে? সবটাই তো বেআইনি।

খবরে যা দেখলাম তাতে, ২৩ জন ল-অফিসারকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এগুলি সব নতুন পদ। কৃষি বিপণন, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব, কারিগরি শিক্ষা, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধীনস্থ ডাইরেক্টরেট, জলপাইগুড়ি-বর্ধমান-মেদিনীপুর ডিভিশনাল কমিশনারের কার্যালয়, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতা পুলিশ কমিশনার, আসানসোল দুর্গাপুর, হাওড়া, বিধাননগর,শিলিগুড়ি, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এবং আলিপুরদুয়ার, ঝাড়গ্রাম, হুগলি, নদিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলাশাসকের কার্যালয়ে। নজর রাখা হয়েছে ফৌজদারি আইনে পারদর্শী আইনি পরামর্শদাতা নিয়োগে।

আপনার এই উদ্যোগ বলে দিচ্ছে, আপনার ভয়। মানে আরও অনেক দপ্তরের কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চিন্তা হয় দিদি। চিন্তা হয়। টাকা নেই তবু খরচ করতেই হবে। অপগণ্ড, চোর, দুর্নীতিবাজ ভাইদের বাঁচাতে এমন উদ্যোগী দিদিকে এই অধম ভাইয়ের শতকোটি প্রণাম। □

অতিথি কলম

আর জগন্নাথন

সাপ্তাহিক ৭০ ঘণ্টার কর্মকাল প্রসঙ্গে এন.আর নারায়ণমূর্তি

‘চাকরি ও জীবন সমার্থক’— এই ধারণা পোষণকারী মানুষ কী এহেন ধারণার বশবর্তী হওয়ার পূর্বে সেই রকম এক জগতের সাক্ষী কোনো দিন থাকেনি?

ইনফোসিস কোম্পানির সহ-প্রতিষ্ঠাতা এন.আর নারায়ণমূর্তি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্য অনেক পদ্ধতির উল্লেখক্রমে, ৭০ ঘণ্টা ব্যাপী কর্মসপ্তাহের অবতারণা করে সম্প্রতি ঈষৎ আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, শিল্পসমূহে মানব সম্পদ বা এইচআর বিভাগের সঙ্গে যুক্ত পেশাদার কর্মীমহল ও ডাক্তাররা প্রবল দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাদের আশঙ্কা এহেন চিন্তাধারার বাস্তবায়ন ভবিষ্যতে হয়তো আরও বেশি কাজের চাপজনিত ধকলে পর্যবসিত হবে এবং পরিণতিতে যুবসমাজের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

এটি একটি অহেতুক বিতর্ক হলেও, ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনীয়। এই বিতর্ক অপ্রয়োজনীয় কারণ এই বক্তব্যের মাধ্যমে নারায়ণমূর্তি কোম্পানিকেগুলিকে শ্রমিক ও কর্মচারীদের অধিক মাত্রায় শোষণের কোনও বার্তা দেননি। কিন্তু তিনি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতামূলক স্তরে ভারতের অগ্রগতির উদ্দেশ্যে তরুণ সমাজকে কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে আরও ভালো ভাবে কাজ করতে উদ্দীপ্ত করেছেন। এই আহ্বানের লক্ষ্য হলো আপামর যুবসমাজ, নিয়োগকর্তারা নন।

এমতাবস্থায়, এই আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ৭০ ঘণ্টা বিশিষ্ট কর্মসপ্তাহ শ্রেণী নির্বিশেষে ভারতীয় জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশে ইতিমধ্যেই বহুল প্রচলিত হলেও, অদূর ভবিষ্যতে ‘৭০ বছরের কর্মজীবন’ সৃষ্টি করতে চলেছে প্রযুক্তি পরিচালিত, স্থায়ী কর্মসংস্থানহীন, মুক্ত-বাজার নির্ভর অর্থনীতি। ‘৭০’ সংখ্যাটি এই ক্ষেত্রে কোনও আদর্শ বা পরম মাপদণ্ড হিসেবে নয়, কিন্তু স্বাভাবিক গড় কর্মকাল বা কর্মজীবন অপেক্ষা অধিক সময়কাল নিরূপণের এক প্রতীকী প্রতিশব্দরূপে বিবেচিত হতে পারে।

যে জনগোষ্ঠীগুলি এযাবৎকালে সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজ করে, তাদের কথাও ভাবতে হবে। এই জনবিন্যাসের শীর্ষস্তরে থাকা স্টার্টআপ কোম্পানিসমূহ ও সেখানে উচ্চপদে আসীন কর্মীবৃন্দ সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা সময়কালব্যাপী শ্রমদান করে থাকেন। সেখানে বিনিয়োগকারীরা তাদের থেকে ঠিক সেটাই প্রত্যাশা করেন। এই বিন্যাসের নীচুতলায় অবস্থানকারী, স্বনিযুক্তি ক্ষেত্রের অন্তর্গত পথপ্রান্তে ব্যবসারত হকারশ্রেণী, ‘পকোড়া বিক্রেতা’ (যাদের কিয়দংশ মুদ্রা যোজনার সুবিধাপ্রাপ্ত) সাপ্তাহিক ৭০ ঘণ্টা কর্মরত শ্রমিক। তারা যদি এই ক্ষুদ্র ব্যবসা সমূহকে দীর্ঘ সময় চালু না রাখেন, তবে তাদের পরিবারের অন্নের সংস্থান প্রায় অসম্ভব। সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে, ৪০ কোটির অধিক ব্যক্তি এবং ১.১ কোটির বেশি মুদি ও রকমারি সামগ্রী বিক্রির ছোটো দোকানকে মুদ্রা যোজনার অধীনে ঋণদান করা হয়েছে।

এর পরের স্তরে আছেন বহুল সংখ্যক মানুষ— ওলা, উবেরের মতো ট্যাক্সি পরিষেবা, সুইগি, জোমাটো, আমাজন, ফ্লিপকার্ট, জিওমার্টের মতো সংস্থায় খাদ্য ও অন্যান্য পণ্য সরবরাহ, খুচরো ব্যবসা, বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থা, ইলেকট্রনিক যন্ত্র / গ্যাজেট সারাই, যানবাহন মেরামত, গুদামজাতকরণ (warehousing) ও পণ্য সরবরাহ (logistics) ইত্যাদি ক্ষেত্র সমূহের সঙ্গে যারা যুক্ত। সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজের এই অলিখিত নিয়মের হয়তো একমাত্র ব্যতিক্রম হলো— কৃষিক্ষেত্র। যদিও কৃষকসমাজ যথেষ্ট পরিশ্রমী নন এরকমটা ভাবার কোনো কারণ নেই। কৃষিক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় অদৃশ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির দরুন সম্ভ্রান্ত কৃষক পরিবার সমূহে কর্মসপ্তাহের মেয়াদ ৭০ ঘণ্টার অনেক কম। দুর্নামগ্রস্ত রাজনীতিক ও পুলিশবাহিনীও সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজ করে থাকেন। শহুরে বেতনভুক কর্মচারীবৃন্দরা সপ্তাহে ৪০-৪৫ ঘণ্টা কাজ করলেও, তাদের গণপরিবহণে যাতায়াত, বাড়ির বাইরে অতিবাহিত সময়, কর্মক্ষেত্রের বিরতির সময়— এই সব কিছু যোগ করলে সর্বমোট সময়কাল ৭০ ঘণ্টার সীমা অতিক্রম করে যায়।

এইসব বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্তিটা আসলে কী? ভারতীয়রা ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত শ্রমদানকারী একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে যাদের পক্ষে এর চেয়েও বেশি কিছু করা প্রায় অসম্ভব?

নাহ্, সেরকম কিছু হয়তো নয়। কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে নানাবিধ কাজে নিযুক্ত শ্রমিক সমাজের সুনিপুণ শ্রেণীবিভাজন বর্তমান সময়ের এক বিস্ময়কর বাস্তবতা! যে বিভাজন রেখার দুই বিপরীত মেরুপ্রান্তে

সর্বোচ্চ কর্মসংস্থানের হাতছানি। এর এক প্রান্তে উচ্চস্তরীয় কর্মদক্ষতাসম্পন্ন ক্ষেত্র যথা— সাইবার নিরাপত্তা, এ.আই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বাহ্যিক নির্দেশ সংবলিত বিন্যাস ব্যতীত কোনো কাজ সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য কম্পিউটার ব্যবস্থায় ব্যবহৃত অ্যালগরিদম ও পরিসংখ্যান মডেলের অধ্যয়ন ও গবেষণা (সংক্ষেপে কম্পিউটার প্রোগ্রামিঙের কৌশল বা মেশিন লার্নিং, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত গবেষণা ক্ষেত্রের একটি উপক্ষেত্র), কম্পিউটার প্রোগ্রাম ডিজাইন ইত্যাদি, যার বিপ্রতীপে রয়েছে আংশিকভাবে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ভিত্তিক অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতা সম্পন্ন কর্মক্ষেত্র। যেমন— গুগল ম্যাপ ব্যবহারকারী একজন উবের চালক; তার করা পণ্য সরবরাহের সম্পূর্ণ খতিয়ান স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে নথিভুক্তকারী একজন পণ্য সরবরাহকারী বা ডেলিভারি বয়; বিল্ডিং কমপ্লেক্স / গেটেড কমিউনিটির দ্বারপ্রান্তে অতিথির উপস্থিতি কোনো গৃহকর্তাকে বিশেষ সফট্‌ওয়্যারের মাধ্যমে অবহিত করা একজন নিরাপত্তারক্ষী। এরা সকলেই কায়িক শ্রমদানকারী বা চাকুরিজীবী এই 'ব্লু কলার পরিষেবা ক্ষেত্রের' অন্তর্গত শ্রমিক সম্প্রদায় যাদের উপার্জন তাদের শ্রমদানের সময়কালের সঙ্গে সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট।

মধ্যমমানের দক্ষতা, মধ্যস্তরীয় কর্মক্ষেত্র, মধ্যবিত্তশ্রেণীর কর্মসংস্থানসমূহের ক্রমাগত সংকোচনের সাক্ষী থাকছে দেশ। এর মধ্যে রয়েছে ব্যাংক কর্মী, যোগাযোগ / টেলিকম বিভাগ ও কলসেন্টারগুলির কর্মচারী। ছোটো খাটো কারখানা বা সংস্থায় কর্মরত শ্রমিক, স্বল্পদক্ষ তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী ছাড়াও আরও অনেকেই। কর্মক্ষেত্রের এই অংশটি স্বয়ংক্রিয়তা (অটোমেশন), অ্যালগরিদমের ব্যবহার ও প্রযুক্তির ক্রমোন্নতির দ্বারা দ্রুতহারে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। এমনকি, চিকিৎসাক্ষেত্রে— রোগী ও আক্রান্তদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য এমবিবিএস পাশ ডাক্তার অপেক্ষা প্রশিক্ষিত নার্সদের গুরুত্ব আজ বেশি। কারণ অ্যালার্জি প্রবণতা ও অতীতের অসুস্থতার যাবতীয় তথ্য-সহ একজন রোগীর চিকিৎসার সম্পূর্ণ বিবরণ— তথ্য (data) ব্যাংক ও অ্যালগরিদমের মাধ্যমে সংরক্ষণ সম্ভব। এই পদ্ধতিতে একজন চিকিৎসকের ৯০ ভাগ কাজ প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে করে ফেলা যায়।

মাঝারি মাপের ক্লিনিক খুলে সারিবদ্ধভাবে লাইন দেওয়া রোগীদের জন্য ওষুধের প্রেসক্রিপশন লেখার পদ্ধতির পরিবর্তে ভবিষ্যতে চিকিৎসকরা হয়তো রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রযুক্তির প্রতি নির্ভরশীল টেলি-কনসালট্যান্ট বা অনলাইন পরামর্শদানকারী হয়ে উঠবেন। এই ক্ষেত্রে একজন ডাক্তারের পারদর্শিতার স্থান অধিকার করতে চলেছে প্রযুক্তি। ভবিষ্যতে মানুষ এই প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে নিজেরাই রোগ নির্ণয় ও উপযুক্ত ওষুধের প্রয়োগ শুরু করলে একজন ডাক্তারকে হয়তো সমপরিমাণ আয় করতে দীর্ঘ সময় ধরে আরও কঠিন পরিশ্রম করতে হতে পারে। একজন রোগীর নির্দিষ্ট চিকিৎসাধীন অবস্থা বিষয়ে একজন এমবিবিএস পাশ ডাক্তার এবং সেই প্রশ্ন রেখে পাওয়া গুগল সার্চের ফলাফলের মধ্যে ব্যবধান সেই দিন প্রায় ঘুচে যাওয়ার উপক্রম হবে।

সরকারি চাকরিসমূহ এই ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী। এই কারণে উত্তরপ্রদেশ, এমনকী কেরালায়— ইঞ্জিনিয়ার এবং পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্তরা সরকারি পিয়নের পদে আবেদন করছে। যদিও কেরলে শিক্ষার হার ও মান অন্য রাজ্যগুলি অপেক্ষা উন্নত। সামরিক বাহিনীর স্থায়ী পদে ছাড়াও 'অগ্নিবীর' প্রকল্পেও আবেদন জমা পড়ে কেরলে। সরকারি নীতির ব্যর্থতার দরুন সমাজের একটা বড়ো অংশ সরকারি চাকরি নামক সামাজিক নিরাপত্তার ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাওয়ার ফলে ভবিষ্যতে সরকারি কাজের পরিসরেও স্থায়ী চাকরির পরিবর্তে চুক্তিভিত্তিক চাকরির রমরমা হওয়ার সম্ভাবনা।

ওল্ড পেনশন স্কিমের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষারত সরকারি কর্মচারীরা (যে স্কিমটি কর্মচারীদের আর্থিক অবদান অপেক্ষা আর্থিক সুবিধার পথটি প্রশস্ত করে) যতদিন অপেক্ষা করবেন, সেই স্কিম বাবদ পেনশন লাভের জন্য হয়তো ততোই দীর্ঘতম হবে তাদের কর্মজীবন। বর্তমানে একজন সরকারি চাকুরিজীবীর কর্মজীবনের সূত্রপাত ২৫ বছর বয়সে হলে , ২০৫৮ সালে তিনি তাঁর ৬০ বছর বয়স হলেও হয়তো অবসর গ্রহণে অক্ষম হবেন। কারণ, তত দিনে জনসংখ্যাগত সংকোচনের ফলে পেনশন তহবিলে আর্থিক অবদানকারী অপেক্ষাকৃত কম বয়সি তরুণ কর্মচারীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। সম্ভবত সরকারি কর্মচারীদের কর্মকালের মেয়াদ ও অবসর গ্রহণের বয়স বেড়ে ৭০ বছর হবে।

এহেন স্থায়ী কর্মসংস্থানহীন, মুক্ত বাজার নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দীর্ঘসময়ের কর্মবিরতি / কর্মহীনতাযুক্ত, কম উপার্জনক্ষম এবং একজন মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে যতদিন কর্মক্ষম থাকবেন ততোদিনের বর্ধিত কর্মজীবনসম্পন্ন ৭০ ঘণ্টা বিশিষ্ট কর্মসপ্তাহ বাস্তবায়িত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।

সরকার ও বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থার পরিবর্তে নিজস্ব পদ্ধতিতে বা কোনো অনন্য ফর্মুলায় পণ্য উৎপাদনকারী এবং পরিষেবা প্রদানকারী স্টার্টআপ কোম্পানি সমূহের মাধ্যমে সৃষ্টি হবে ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান। 'চাকরি' হারাতে পারে তার স্থায়িত্বের চরিত্র। ৭০ ঘণ্টা বিশিষ্ট কর্মসপ্তাহ সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয়তো নয়। কারণ অদক্ষতা ও কাজের গুণমানজনিত সমস্যা নিরসনে এটি একটি অস্থায়ী সমাধান। এই কারণে মানুষকে খরচ কমিয়ে আর্থিক সঞ্চয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এই ব্যবস্থা হয়তো ন্যায়নীতিহীন, ভবিষ্যতের এক বিভীষিকাময় পৃথিবী বা ডিস্টোপিয়ান বিশ্বের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু 'চাকরি ও জীবন সমার্থক'— এই ধারণা পোষণকারী মানুষ কী এহেন ধারণার বশবর্তী হওয়ার পূর্বে সেই রকম এক জগতের সাক্ষী কোনো দিন থাকেনি?

(লেখক স্বরাজ্য পত্রিকার সম্পাদকীয় নির্দেশক)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

ভারতমাতা কী জয়

ভারতীয় রাজনীতিতে একশ্রেণীর রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব আছে, যারা 'ভারতমাতা কী জয়' স্লোগান ফোবিয়ায় আক্রান্ত। ভারতমাতা কী জয় শুনলেই তাঁদের মনে হয় এই বোধহয় হিন্দুরা তাঁদের 'মুসলমান ভাই'দের মারতে এল। কিংবা বিজেপি আবার ক্ষমতায় এসে গেল। বাস্তবিক ভারতমাতা কী জয় কিছু রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকের জন্য আজ রাজনৈতিক স্লোগানে পরিণত হলেও এটি যে আসলে দেশমাতৃকার বন্দনা ছাড়া আর কিছু নয়, তা উপলব্ধির সময় বোধহয় এসেছে। কারণ রাজনৈতিক মত-পথ নির্বিশেষে আপামর দেশবাসী তো বটেই, এমনকী বিদেশিরাও এই স্লোগানকে যে আপন করে নিয়েছে, তার প্রমাণ বারবার মিলেছে চলতি বিশ্বকাপে।

যেমন বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ২০২৩ বিশ্বকাপের অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান ম্যাচে গ্যালারিতে দু'রকম চিত্র। বিরাট কোহলির আরসিবি-র হোম গ্রাউন্ডের গ্যালারিতে এখন অস্ট্রেলিয়ান সমর্থককে 'ভারতমাতা কী জয়' স্লোগান দিতে দেখা যায়।

তাই শুনে গ্যালারির অপর প্রান্তে এক পাকিস্তানি 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে চীৎকার করতে থাকে। তখন তার পাশে বসে থাকা দর্শকরা জোরে ভারতমাতা কী জয় স্লোগান দিতে থাকেন। ফলে সেই পাকিস্তানি ব্যক্তি চুপ করে যান।

অন্যদিকে এব্যাপারে আশ্চর্যজনক ঘটনাটি ঘটে অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচ চলাকালীন। ভারতের ম্যাচ ছিল না মোটেও, তা সত্ত্বেও ধরমশালার গ্যালারি ছিল কার্যত ভিড়ে ঠাসা। ধরমশালায় জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেই এগিয়ে যায় টিম অস্ট্রেলিয়া। এই হাইভোল্টেজ ম্যাচের মধ্যে হঠাৎই অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকদের মুখে 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনি শোনা গেল। পরে 'জয় সিয়ারাম' স্লোগানও শোনা যায় তাঁদের মুখে। এদিকে একই সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরাও গলা মেলান সেই কোরাসে। এই স্লোগান দেওয়ার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিটি চীৎকার করে বেশ কয়েকবার 'ভারতমাতা কী জয়' স্লোগান দিচ্ছেন।

এদেশে 'ভারতমাতা কী জয়' বলা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক চলছে। কেউ এই আপ্তবাক্যকে রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করে। আবার কেউ নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে দেশমাতৃকার জয়গানে অস্বীকার করে। কিন্তু এদেশে যতই বিতর্ক হোক, বিদেশের মাটিতেও এখন হিট 'ভারতমাতা কী জয়' স্লোগান। সম্প্রতি, ভারত-নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ চলাকালীন অকল্যান্ডের মাঠে প্রতিধ্বনিত হলো সেই 'ভারতমাতা কী জয়' স্লোগান।

এককালে কমিউনিস্টরা তাদের কায়েমি স্বার্থে আল্লাহ্ হো আকবর কিংবা নারায়ে তকবীর-এর মতো স্লোগানের সঙ্গে এদের প্রতিদ্বন্দ্বী স্লোগান হিসেবে 'ভারতমাতা কী জয়'-কে একাসনে বসিয়ে যে ভারতবাসীর প্রাণের ধ্বনিকে সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক বলে কলুষিত করেছিল, তার থেকে মুক্তি পাওয়া সময়ের অপেক্ষা।

ক্রিকেট মাঠে অবশ্য বিদেশেও 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনি সাম্প্রতিক অতীতে বহুবার শোনা গিয়েছে। দু'বছর আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় অকল্যান্ডে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সময় ভাইরাল হওয়া এক ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছিল, এক কিউয়ি সমর্থক 'ভারতমাতা কী জয়' বলার চেষ্টা করছেন। ভারতীয়দের মতো আবেগের সঙ্গে স্লোগান দিতে না পারলেও, তাঁর শেখার ও বলার ইচ্ছেটাই মন জয় করেছিল নেটিজেনদের। তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়েছিলেন অন্যরাও। ট্যুইটারে যে ভিডিয়োটি পোস্ট হয়েছিল, সেটি কবেকার তা উল্লেখ না থাকলেও প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল এটা অকল্যান্ডে দ্বিতীয় ম্যাচের সময়কার ভিডিয়ো।

সুতরাং ক্রিকেট মাঠের ঘটনা বারবার প্রমাণ করছে 'ভারতমাতা কী জয়' কোনো রাজনৈতিক স্লোগান নয়, এই স্লোগানের সঙ্গে রাজনীতির সরাসরি যোগ থাকাও উচিত নয়। প্রত্যেক দেশভক্ত ভারতবাসীর দল-মত, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের এই প্রাণের স্লোগান দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত। এখন এমনও দেখা যাচ্ছে বিদেশিরাও 'ভারতমাতা কী জয়' তাঁদের বিজয়ের স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করছে।

এককালে কমিউনিস্টরা তাদের কায়েমি স্বার্থে আল্লাহ্ হো আকবর কিংবা নারায়ে তকবীর-এর মতো স্লোগানের সঙ্গে এদের প্রতিদ্বন্দ্বী স্লোগান হিসেবে 'ভারতমাতা কী জয়'-কে একাসনে বসিয়ে যে ভারতবাসীর প্রাণের ধ্বনিকে সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক বলে কলুষিত করেছিল, তার থেকে মুক্তি পাওয়া সময়ের অপেক্ষা। □

শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে যে কোনো সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রতিবাদ করতে হবে

আনন্দ মোহন দাস

১৯৪৮ সালে ইজরায়েল স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই প্যালেস্তাইন ইজরায়েলের যুদ্ধ চলেছে। একথা অনস্বীকার্য পৃথিবীতে ইসলাম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা ও আগ্রাসনের মানসিকতাই অশান্তি ডেকে এনেছে। দেখা গেছে উভয়েই শান্তির বাণী প্রচার করলেও নিজেদের প্রয়োজনে তারা হিংসার আশ্রয় নিতে দ্বিধাবোধ করে না। উদাহরণস্বরূপ আরব দুনিয়ার লড়াই, জম্মু-কাশ্মীরে পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গি হামলা এবং সাম্প্রতিক কালে মণিপুরে খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকায় হিংসা ও সংঘর্ষের পরিবেশ। হিংসার আশ্রয় নিয়ে ভূখণ্ড দখলের লড়াই কিন্তু একমাত্র হিন্দুধর্মে নেই। কোনো আগ্রাসন বা অন্যের দেশ দখল নেওয়ার কোনো নজির নেই। সেজন্য ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় গণতন্ত্র সুরক্ষিত রয়েছে এবং শান্তি বজায় রয়েছে। হিন্দুরা বলেছে 'সর্বে ভবন্তু সুখিন সর্বে সন্তু নিরাময়া' অর্থাৎ সকলে সুখী হোক, সকলে নিরাময় হোক। 'যত মত তত পথের' কথা হিন্দুরাই বলেছে। বসুধৈব কুটম্বকমের কথা হিন্দুরা বলেছে। সারা বিশ্ব এক পরিবার এই ধারণা হিন্দুরা দিয়েছে।

সেজন্য ভারত কখনও এই ধরনের অসহিষ্ণুতার পথে আগ্রাসী মনোভাব নেয়নি। কিন্তু ইসলামিক দুনিয়ায় যে ধরনের উগ্রপন্থা ও জেহাদি কার্যকলাপ চলেছে তা বিশ্ব শান্তির পক্ষে অন্তরায়। সকলকে বলপূর্বক ইসলামের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসার পরিকল্পিত প্রয়াসই হলো গণ্ডগোলের মূল কারণ। বর্তমানে হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধের প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যায়, ইহুদিরা একসময় পৃথিবীর সবচেয়ে আলোচিত যাযাবর জাতি ছিল। উৎপীড়নের শিকার হয়ে অস্তিত্ব রক্ষায় তারা বার বার বিতাড়িত হয়েছে একস্থান থেকে আরেক স্থানে। এদের আদি নিবাস ছিল প্যালেস্তাইন-লেবানন-জর্ডন-সিরিয়া অঞ্চলে। এরা বিতাড়িত হয়ে জার্মানি-সহ পশ্চিমি দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯৭ সালে থিয়োদার হারজেল নামে এক ইহুদি হোমল্যান্ড স্থাপনের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

ক্রমশ সেই আন্দোলন জার্মানি-সহ পশ্চিম দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ইহুদিরা বহু বছর ধরে একটি দিনে মিলিত হয়ে একই সংকল্প গ্রহণ করতো 'Next year in Zeruzalem' অর্থাৎ পরের বছর মিলনের স্থান রাজধানী জেরুজালেম। প্রখর রাষ্ট্রভক্তি, আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় সংকল্পের ফলে ১৯৪৮ সালে ইজরায়েল স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো। বিশ্বের একমাত্র ইহুদি দেশ হলো ইজরায়েল। কিন্তু প্যালেস্তাইন-সহ আরব দুনিয়া ইজরায়েলকে দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিল না। আরব দেশগুলো নব গঠিত ইহুদি দেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করে দিল। সেজন্য বেশিরভাগ সময় এই অঞ্চলে লড়াই লেগে থাকল। ইজরায়েল চারিদিকে শত্রু বেষ্টিত হয়েও নিজেকে রক্ষা করতে পালটা লড়াই চালিয়ে গেল। জেহাদি শক্তির মোকাবিলায় ইজরায়েল নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগলো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইজরায়েলে ১৮ বছর বয়স থেকেই পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলের সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক রয়েছে। প্রয়োজনে দেশ রক্ষার্থে সকলকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হয়। এমনকী দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছেলেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যেমন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ছেলে বাবার আশীর্বাদ নিয়ে হামাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন। ছোট্টো দেশ হলেও ইহুদি জাতি সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে বিশ্বের অনেক দেশের থেকে এগিয়ে রয়েছে। নীচের তথ্য দেখে বুঝতে পারা যাবে বিজ্ঞান, সাহিত্য ও মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে 'অভিশপ্ত' ইহুদি জাতির অবদান। এঁদের এই অবদান ছাড়া মানুষ পড়ে থাকতো কয়েক শতাব্দী পিছনে।

(১) ফিজিক্সে ৫১টি নোবেল পুরস্কার (ফিজিক্স নোবেলের ২৬ শতাংশ)। (২) কেমিস্ট্রিতে ৩৬টি নোবেল পুরস্কার (কেমিস্ট্রি নোবেলের ২০ শতাংশ)। (৩) মেডিসিন বা ফিজিওলজিতে ৫৫টি নোবেল পুরস্কার (মেডিসিন নোবেলের ২৬ শতাংশ)। (৪) অর্থনীতিতে ২৯টি নোবেল পুরস্কার (অর্থনীতি নোবেলের ৩৮ শতাংশ)। (৫) শান্তিতে (পিস) ৯টি নোবেল পুরস্কার (পিস নোবেলের ৯ শতাংশ)। (৬) সাহিত্যে ১৪টি নোবেল পুরস্কার (সাহিত্য নোবেলের ১৩ শতাংশ)।

সারা পৃথিবীতে ইহুদি জনসংখ্যা মাত্র ১.৫ কোটির কিছু বেশি (প্রায় ৯০ লক্ষ ইজরায়েলে, বাদবাকি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে)। প্রগাঢ় দেশভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েও ইজরায়েল মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। কয়েক বছর আগে ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লাহ খোমেইনি সমগ্র ইসলামি দুনিয়াকে অনুরোধ করেছিলেন 'Boycott anything and everything that originates with the Jewish people.' এরা ইহুদি জাতিকে সহ্য করতে পারে না।

> সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে যে কোনো ধরনের উগ্রপন্থী হামলাকে দলমত নির্বিশেষে সকলকে একযোগে প্রতিবাদ করতে হবে। তা নাহলে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে।

ইজরায়েলকে ঘিরে রয়েছে মিশর, জর্ডন, লেবানন, সিরিয়া, ওয়েস্ট ব্যাংক, গাজা স্ট্রিপ ও উপকূলবর্তী অঞ্চল। এই দেশগুলির সকলেই ইসলামের অনুগামী। সেজন্য একমাত্র ইহুদি দেশ ইজরায়েলকে ইসলামিক দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রায়শ যুদ্ধ লেগেই থাকে। গাজা অঞ্চলটি মূলত ইজরায়েলি সীমান্ত এলাকায়। এখানে জেহাদি শক্তি হামাস যুদ্ধ করার জন্য বিস্তীর্ণ এলাকায় অনেক সুড়ঙ্গ বানিয়ে রেখেছে।

ইজরায়েলের আয়তন ২০৭৭০

ফঃ ২

বর্গকিলোমিটার। ভূখণ্ড রয়েছে ৯৭.৮৮ শতাংশ এবং ২.১২ শতাংশ রয়েছে জল। অন্যদিকে সীমান্তবর্তী গাজাস্ট্রিপের প্যালেস্তাইনে জনসংখ্যা ২২ লক্ষ এবং আয়তন হলো ৩৬৫ বর্গকিলোমিটার। এদের পিছনে আরব দুনিয়ার সমর্থন রয়েছে। যদিও ১৯৬৭ সাল থেকে ইজরায়েল এই অঞ্চলে শাসন করতো যা আগে মিশরের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু ২০০5 সালে অসলো চুক্তির ফলে শান্তির পক্ষে ইজরায়েল গাজাস্ট্রিপ অঞ্চল থেকে সরে আসে। ২০০৭ সালে জঙ্গি সংগঠন হামাস মহম্মদ ফতেহকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করে। এরা জন্মলগ্ন থেকেই ইজরায়েলকে ধ্বংস করে ইসলামিক দেশে রূপান্তরিত করার শপথ নিয়েছিল। ইহুদি জাতির বিনাশ সাধনই হলো তাদের মূল লক্ষ্য। সেজন্য এরা মাঝে মাঝেই সীমান্ত অতিক্রম করে নৃশংস হামলা চালিয়ে নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করেছে। দেশ হিসেবে ইরান অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হামাসকে মদত দিয়ে চলেছে। মুসলিম ব্রাদারহুডের দোহাই দিয়ে আরব দুনিয়া এদের পিছনে রয়েছে। ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই হামাস বহুবার ইজরায়েলের উপর হামলা করেছে। ১৯৯৫ সাল থেকে উগ্রপন্থী হামাস বিভিন্ন সময়ে বর্বরোচিত জঙ্গি হামলা চালিয়ে ইজরায়েলের বহু নিষ্পাপ শিশু, মহিলা-সহ প্রায় ১২০০ নাগরিককে বিভিন্ন সময়ে হত্যা করেছে।

গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে হামাসের বিধ্বংসী রকেট হানার ফলে ইজরায়েলের বহু নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের প্রাণ গেছে। এই আক্রমণে অনেক শিশু, মহিলা-সহ বহু বিদেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এবং অনেককে অপহরণ করে গাজাস্ট্রিপে বন্দি করে রাখা হয়েছে। মহিলাদের ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। নৃশংসতার হাত থেকে শিশু ও বৃদ্ধদেরও বাদ দেওয়া হয়নি। মহিলা ও শিশুদের প্রতি হামাসের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। তার ফলে ইজরায়েল তার দেশের সুরক্ষায় এবং নিজের দেশের জনগণের নিরাপত্তায় চুপ না থেকে পালটা আক্রমণ করবে এটাই স্বাভাবিক। হামাসকে নির্মূল করতে প্যালেস্তাইন অধ্যুষিত সীমান্তবর্তী গাজা স্ট্রিপের উপর ইজরায়েল তীব্র আক্রমণ চালিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের যোগ্য জবাব দিয়েছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেছেন জেহাদি শক্তি হামাস যতক্ষণ না নিশ্চিহ্ন হচ্ছে ততক্ষণ তাদের লড়াই চলবে।

সন্ত্রাসবাদ হলো মানবতার শত্রু। বিশ্বশান্তির জন্য দলমত নির্বিশেষে এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী জেহাদি শক্তির বিরুদ্ধে সকলের গর্জে ওঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইজরায়েলের পালটা আক্রমণে প্যালেস্তাইনে হামাসের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির পর বিভিন্ন দেশে আলোড়ন উঠেছে। হামাসের পক্ষে রয়েছে মোল্লাবাদী মুসলমান ও বামপন্থীরা আর অন্যদিকে রয়েছে দক্ষিণপন্থীরা। ইজরায়েল- প্যালেস্তাইন যুদ্ধে বিভিন্ন বিতর্ক সামনে এসেছে। এই লড়াই নতুন কিছু নয়, বহুবার যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। এর মূল কারণ হলো ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং ইহুদিদের বিনাশ করা। সর্বোপরি ইজরায়েলকে ইসলামিক দেশে পরিণত করা।

ভাবতে অবাক লাগে আমাদের দেশের বামপন্থী ও কিছু মুসলমান সংগঠন হামাস ও হিজবুল্লাহর মতো জঙ্গি সংগঠনের নিন্দা না করে এদের সপক্ষে মিছিল বের করেছে। জেহাদি সংগঠন গুলো সারা দেশে ইজরায়েল ও আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল বের করেছে। মুসলমান ভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়ে পথে নেমেছে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলো এবং সারা দেশে এদের সমর্থনে মিছিল করেছে। এমনকী গত ২৭ অক্টোবর বামপন্থী রাজত্বে জামায়াত-ই-ইসলামের ব্যানারে কেরালার মল্লাপুরমে হামাসের সমর্থনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসি নেতারা যোগ দিয়েছিলেন। এই সভায় উগ্রপন্থী হামাসের নেতা খালেদ মাসহাল ভার্চুয়ালি বক্তৃতা দিয়েছেন বলে শোনা গিয়েছে। কিন্তু কেরালার কমিউনিস্ট সরকার এখনও পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এই নীরবতার কারণ হলো মুসলমান ভোট, কারণ কেরালায় সংখ্যালঘুদের ভোট রয়েছে ৪৫.৩ শতাংশ যার মধ্যে মুসলমান ২৬.৬ শতাংশ এবং খ্রিস্টান ১৮.৪ শতাংশ। ঘটনাচক্রে এই সভার পরই এর্নাকুলামের একটি চার্চে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো জঙ্গি হামাসের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের পালটা আক্রমণের প্রতিবাদে মিছিল বের করেছে।

এরা হামাসের নৃশংস ও বর্বরোচিত হত্যার প্রতিবাদে মিছিল করে না, এরা বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে মিছিল করে না, এরা কাশ্মীর থেকে হিন্দু পণ্ডিতদের বিতাড়নের বিরুদ্ধে মিছিল করে না, এরা জম্মু-কাশ্মীরের উগ্রপন্থী হামলা ও জেহাদি শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয় না। বরং এরা আক্রান্ত ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় কিন্তু জঙ্গি হামাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার নয়। এরা প্যালেস্তানিদের মানবাধিকারের কথা বলে কিন্তু জম্মু কাশ্মীরে সংখ্যালঘু হিন্দু পণ্ডিতদের মানবাধিকারের কথা বলে না। এরা নোয়াখালী দাঙ্গার বিরুদ্ধে মুখ খোলে না, এরা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং এর প্রতিবাদ করে না। অথচ প্যালেস্তানিদের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়। এটাই হলো বামপন্থীদের দ্বিচারিতার প্রকৃত নিদর্শন। এরা বর্বর হামাস, হিজবুল্লাহর, আইএসআই, আইসিস ও জয়েশ-ই- মহম্মদের ভূমিকার নিন্দা করে না।

নিরীহ নির্দোষ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে যারা উল্লসিত হয় তাদের কোনোভাবেই ভারত সমর্থন করে না। ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলিই বিশ্বের বেশিরভাগ অঞ্চলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। এদের বিরুদ্ধে লড়তে হলে সমস্ত দেশকে এদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে। সন্ত্রাসবাদীরা হলো সমাজের শত্রু, দেশের শত্রু, উন্নয়নের শত্রু এবং মানবতার শত্রু। তাই জেহাদি শক্তিকে সমূলে উৎপাটিত করতেই হবে, তবেই বিশ্বে শান্তি আসবে। এ বিষয়ে ভারতের ভূমিকা অবশ্যই সদর্থক। ভারতেও বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের অনেক গাজাস্ট্রিপ রয়েছে। ভারতকেও সাবধান থাকতে হবে। উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নিলে কান্দাহার বিমান অপহরণের মতো ঘটনা আবার ঘটবে। ২৬/১১ মুম্বাই হামলার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। নিরীহ নিরপরাধ মানুষের প্রাণ চলে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশের বিরোধীরা হামাসের হামলায় মহিলা, শিশু ও সাধারণ নাগরিকদের হত্যার নিন্দা না করে প্যালেস্তানিদের অধিকার রক্ষায় গলা ফাটিয়ে চলেছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার প্রস্তাবে হামাসের হামলার নিন্দার উল্লেখ না থাকায় ভারত ভোট দানে বিরত থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ ভারত উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে এবং সেজন্য ইজরায়েলের পাশে থেকেছে। প্যালেস্তাইন সমস্যা সমাধানে শান্তিপূর্ণ আলোচনাই একমাত্র পথ। হামাস বা হিজবুল্লাহর হামলার মাধ্যমে নির্দোষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে নয়। ভারত প্যালেস্তানিদের সমস্যা সমাধানে আগে ঘোষিত নীতি বজায় রেখেছে কিন্তু উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইজরায়েলের পাশে থেকেছে। সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে যে কোনো ধরনের উগ্রপন্থী হামলাকে দলমত নির্বিশেষে সকলকে একযোগে প্রতিবাদ করতে হবে। তা নাহলে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে। □

সংরক্ষণ বঞ্চিত বাঙ্গালিকে টানতে চাইছে জাতপাত ভিত্তিক জনগণনায়

সুদীপ্ত গুহ

২০১৪ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদীজী যখন একের পর এক আর্থিক, প্রশাসনিক এবং আইনি সংস্কার এনে দেশের মানুষের জীবনে এক বড়ো পরিবর্তন

আনছিলেন, তখন বিরোধীরা সাধারণ নির্বাচনের প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে নিয়ে আসে রাফেল বিতর্ক। ১৯৬৯-এ ব্যাংক জাতীয়করণ হলেও, দেশের ৫০ শতাংশ মানুষ পরের ৪৫ বছর ব্যাংক, বিমা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিল। মোদীজী তাঁদের ব্যাংকের খাতা খুলে হাতে তুলে দিলেন জীবনবিমা, দুর্ঘটনা বিমা, চিকিৎসা বিমার কাগজ। মহাজনদের থেকে খুচরো ব্যবসায়ী ও চাষিদের মুক্তি দিতে ব্যাংকের মাধ্যমে চালু করলেন মুদ্রালোন-সহ বিভিন্ন প্রকল্প। সঙ্গে কৃষি বিমা থেকে আবাস যোজনা। এক কথায় জীবনে এক বড়ো পরিবর্তন। এই অবস্থায় ২০১৯ সাধারণ নির্বাচনের আগে নেতিবাচক প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে নিয়ে আসা হলো রাফেল বিতর্ক। সঙ্গে ভোট জিতলে মাসে ১২ হাজার টাকার হাতছানি। ভারতের মানুষ জানতেন, রাহুল গান্ধীর স্বর্গীয় পিতৃদেব, তার পিতামহী এবং পিতামহীর পিতা প্রধানমন্ত্রী হয়ে যেখানে একটা ব্যাংকের খাতাই খুলে দেননি, সেখানে তিনি কীভাবে এই টাকা দেবেন। মোদীজী ফিরে এলেন আরও বেশি আসন নিয়ে।

২০২০-তে চীন থেকে কোভিড এসে দেশের আর্থিক কর্মকাণ্ড দিল বন্ধ করে। লকডাউন হাওয়ায় বামপন্থীদের সমালোচনার মুখে পড়েন মোদীজী। কিন্তু মোদীজী মনে করেন, কিছু আর্থিক সূচকের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেশের মানুষের প্রাণ। বিনা পয়সায় ১০০ কোটি মানুষকে ভ্যাকসিন, ৮০ কোটি মানুষকে চাল দেবার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। টাকা ছাপিয়ে মানুষের হাতে না দিয়ে, কৃষক, পশুপালক, মৎস্যজীবী থেকে ছোটো ব্যবসায়ী নতুন উদ্যোগী সবাইকে ব্যবসার মূলধন দেওয়া, জনঔষধি কেন্দ্র থেকে কম দামে ওষুধ ইত্যাদি দেওয়া শুরু হলো। বিনিয়োগ বাড়ানো হলো সড়ক, বন্দর, বিমানবন্দর, রেলপথ, জলপথ, সেচ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, ওষুধ উৎপাদন থেকে স্টিল-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে। প্রতিটি ক্ষেত্রে যখন দেশ সফল, তখন ঝুলি থেকে বের করা হলো জাতপাত ভিত্তিক জনগণনা। উদ্দেশ্য, হিন্দুদের মধ্যে বিভাজন এবং পশ্চিমবঙ্গ মডেল অনুসরণ করে ঘুরপথে মুসলমানদের শিক্ষা, চাকরি এবং জনপ্রতিনিধিত্বে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। নতুন করে ওবিসি তালিকায় মুসলমানদের অন্তর্ভুক্তির চক্রান্ত।

কিন্তু নেহরু-গান্ধী পরিবারের ওবিসি সংরক্ষণ সম্পর্কে কী মতামত ছিল? গান্ধী পরিবারের শেষ প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী রাজত্ব করেন ১৯৮৯ পর্যন্ত। এই রাজপরিবারের কেউই মণ্ডল কমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। ১৯৯০-তে বিজেপি সমর্থিত জনমোর্চা সরকার ওবিসি সংরক্ষণ আনে। রাজীব গান্ধী ওবিসি সংরক্ষণের বিরোধী ছিলেন। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯০, সংসদে ওবিসি সংরক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন তৎকালীন লোকসভার বিরোধীনেতা রাজীব গান্ধী। কিন্তু কংগ্রেসের বিরোধিতার পরেও পাশ হয় মণ্ডল কমিশন। প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য, ২০১৯-এ মোদীজী এসসি, এসটি এবং ওবিসি সংরক্ষণ পায় না এমন সাধারণ গোষ্ঠীর গরিব

মানুষদের জন্যও ১০ শতাংশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা করেন যার নাম হয় ইডব্লু এস অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর সংরক্ষণ।

তাহলে আজ ৩৩ বছর পর কেন রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী জাতভিত্তিক জনগণনা করে

ওবিসি সংরক্ষণ বাড়াতে বলছে?

উত্তর 'পশ্চিমবঙ্গ মডেল'। যা আবার মনে করিয়ে দিচ্ছে গোপালকৃষ্ণ গোখলের সেই বিখ্যাত WHAT BENGAL THINKS TODAY, INDIA THINKS TOMORROW'। তবে এবার নেতিবাচক অর্থে। কিন্তু কী সেই মডেল? এককথায় ওবিসি এবং ইডব্লু এস সংরক্ষণের মোড়কে হিন্দুদের বঞ্চিত করে এক বিশেষ শ্রেণীর মুসলমানদের সরকারি শিক্ষা এবং চাকরি পাইয়ে দেবার মডেল।

১৯৯০-তে মণ্ডল কমিশনে থাকা হিন্দুদের বাদ দিয়ে মুসলমানদের সেই সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে আমাদের রাজ্যে। বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠন, গণসংগঠন এবং বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহার করে হিন্দু ওবিসিদের আজও তালিকা থেকে বাদ রেখেছে আমাদের রাজ্য। মুসলমানদের যাতে হিন্দু ওবিসিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে চাকরি না পেতে হয়, তাই ওবিসি-এ এবং বি দু'টো আলাদা ভাগ করে সংরক্ষণের মধ্যে বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ২০ বছর পর। আজকের বিরোধী জোট তথা I.N.D.I.A. জোট এই নীতি সারা ভারতে চালু করে অন্যান্য রাজ্যের হিন্দু ওবিসিদের সংরক্ষণের পরিমাণ কমিয়ে মুসলমানদের পাইয়ে দিতে চাইছে। সঙ্গে হিন্দু ওবিসিদের একাংশকে যদি ভুল বুঝিয়ে হিন্দু সমাজে বিভাজন তৈরি করা যায়, তবে সেটা উপরি পাওনা। কারণ নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার আর কোনো রাস্তা নেই। এই ইস্যু এক ঢিলে যদি দুই পাখি মারে, সেই অপেক্ষায় গান্ধী পরিবার। মুসলমানদের এক করো এবং সংখ্যাগুরুদের ভাগ করো।

২০১০-এ ক্ষমতা থেকে চলে যাবার আগে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ওবিসি-এ নামে একটি বিশেষ ক্যাটাগরি বানিয়ে মুসলমানদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন, টিকে থাকার শেষ অস্ত্র হিসেবে। ভোটের আগে ঘোষণা করেন, 'এখন থেকে মহাকরণে প্রতি দশ জন কর্মচারীর একজন হবে মুসলমান'। ২০০৯-তে লোকসভা নির্বাচনে ৪২টির মধ্যে ২৭টি আসন হারার পর তিনি বোঝেন ২০১১-তে সংখ্যালঘু ভোট পাবেন না। তাঁর দলের ক্যাডাররা বুঝিয়ে দেন আগামী নির্বাচনে, রিগিং করে নিজেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করবে না তারা। কারণ হারলে উত্তমমধ্যম দেবে জনতা। সেই সময় বিভিন্ন মুসলমান নেতাদের মমতার প্রতি সমর্থন বাড়তে থাকে। যেমন ফুরফুরা শরিফের ত্বহা সিদ্দিকী, আইপিএস নজরুল ইসলাম, টিপু সুলতান মসজিদের বরকতি এবং সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ইত্যাদি। এদের মধ্যে তৃণমূল নেতা ইদ্রিস আলির নেতৃত্বে তসলিমা নাসরিনকে তাড়ানো এবং রিজওয়ানুর হত্যা আন্দোলন রাজ্যের একটা বড়ো সংখ্যার মুসলমান ভোট সিপিএম থেকে তৃণমূলে নিয়ে যায়। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পালটা চাল হিসেবে একঢিলে তিন পাখি মারার চেষ্টা করলেন। সেই চাল হলো এই ওবিসি-এ সংরক্ষণ। জ্যোতি বসু আমাদের রাজ্যে চালু হতে দেয়নি ওবিসি সংরক্ষণ। তবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মণ্ডল কমিশনে থাকা হিন্দুদের বাদ দিয়ে মুসলমানদের বড়ো অংশকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু একটি পাখিও মরলো না জনসংযোগের দুর্বলতার জন্য। এখানে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে জনসংযোগের পদ্ধতির পার্থক্যটা বোঝা দরকার। হিন্দুদের কাছে বার্তা পাঠাতে হলে সংবাদমাধ্যম যথেষ্ট। কিন্তু মুসলমান সমাজে বার্তা পাঠাতে দূত হিসেবে সেই সমাজের ধর্মীয় মাথাদের প্রয়োজন। তাঁরা তখন তৃণমূল-কংগ্রেস-এসইউসিআই জোটের পক্ষে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। সংবাদমাধ্যমে এই খবর মুসলমান ভোটারদের কাছে পাঠানোর ভরসা পেলেন না বুদ্ধদেব। যদি হিন্দুরা রেগে যায়? বিনা জনসংযোগে পাশ হয়ে গেল ওবিসি-এ বিল। হিন্দু বাঙ্গালি জানতেও পারলো না তাঁদের উপর কতবড়ো আঘাত হেনেছেন বঙ্গ সংস্কৃতির গত সাড়ে তিন দশকের স্বঘোষিত ধারক ও বাহক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

১৯৯০-তে বিজেপি সমর্থিত জনমোর্চা সরকার যখন ওবিসি সংরক্ষণ চালু করেন, তখন শিল্পের শ্মশানে পরিণত হওয়া বাঙ্গালি ওবিসি শ্রেণীভুক্ত মানুষ আশায় বুক বাধে সরকারি চাকরির। কিন্তু বাঙ্গালি হিন্দুর এই আশায় জল ঢেলে দেয় সিপিএম। রাজ্যে ওবিসি নেই দাবি করে ২৭ শতাংশ কোটা চালু করলেন না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, রেল থেকে সিভিল সার্ভিস ইত্যাদি চাকরির পরীক্ষায় পিছিয়ে গেল বাংলামাধ্যমে পড়া হিন্দু বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত ছাত্র-ছাত্রীরা। ইংরেজি তুলে এর আগে কিছুটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার সংরক্ষণ থেকেও দূরে রাখা হলো। গত ত্রিশ বছরে আমরা দেখেছি ব্যাংক ও রেলে বাঙ্গালিদের সংখ্যা কীভাবে কমছে। আর যখন ২০১০-এ এই সংরক্ষণ চালু করা হলো, তখন প্রথমেই তাঁদের ২৭ থেকে ১০ শতাংশ ছিনিয়ে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত হিন্দু বাঙ্গালিদের আরও কিছুটা পিছিয়ে দেওয়া হলো। ধরা যাক, রাজ্যে শিক্ষকের মোট শূন্যপদ ১০ হাজার। এবং এখানে ২০১০ পর্যন্ত ১০০ জন মুসলমান শিক্ষক ছিলেন। নতুন ওবিসি নীতি অনুযায়ী ২০১০-এর পরে, শূন্যপদে আরও ৯০০ জন মুসলমান শিক্ষক ওবিসি-এ শ্রেণী থেকে নিলে জেনারেল ক্যাটাগরিতে লোক নেওয়া যাবে। আর এই কারণে জেনারেল ক্যাটেগরির যাদের বয়স পেরিয়ে যাবে, তাঁরা বিফল স্বপ্ন নিয়ে এই জীবনের বাকি দিনগুলি কাটাবে।

পশ্চিমবঙ্গে ওবিসি-দের অবস্থা নিয়ে এনসিবিসি কি বলেছে তাঁদের রিপোর্টে?

১. এই রাজ্যের ১৭৯টি ওবিসি গোষ্ঠীর মধ্যে ১১৮টি মুসলমান।

২. যারা সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের ৯১ শতাংশ মুসলমান।

৩. ২০১১-র পর যে ৭১টি গোষ্ঠীকে যোগ করা হয়, তাঁর ৬৫টি মুসলমান।

৪. বহু বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা ভারতে ওবিসি সার্টিফিকেট জোগাড় করেছে।

কিন্তু কেউ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলেনি কেন? কারণ যাদের হাতে ক্ষমতা তারা কখনো চায়নি যে মাহিষ্য, সদগোপ, বানিয়া বা তিলি ঘরের ছেলে-মেয়েরা আইএএস বা অধ্যাপনা বা রেলের চাকরি পাক। যদিও সংখ্যালঘু পেলে আমাদের গায়ে ফোসকা পড়ে না।

মুসলমানদের কোটা দেবার বিরুদ্ধে বলছি না। কিন্তু হিন্দু ওবিসিদের খরচের খাতায় না রেখে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

যে বামুন, কায়েত, বৈদ্যরা না জেনে আজ বিনা কারণে এই অন্যায়কে সমর্থন করছে, তাঁদের এনসিবিসি-র রিপোর্টের আরেকটা অংশ বলি। গত ৩৩ বছর ওবিসি কোটা না দেবার ফলে বহু গুণে বেড়ে গেছে ধর্ম পরিবর্তন। ১৯৩৭/৪২/৪৬-এ কিন্তু কোনো হিন্দু অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হননি। সেই সময়ও বহু সেক্যুলার হিন্দু নেতা ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কিন্তু কেউ নিজের লোক মনে করেননি।

ধরুন, আজ কলকাতা কর্পোরেশনে ১ হাজার মোট পদ। যত বছর ১৭ শতাংশ অর্থাৎ ১৭০ পদ পূরণ হচ্ছে, তত বছর শুধুমাত্র এই ওবিসি-এ এবং বি থেকে লোক নিতে হবে। এসসি এসটি জেনারেল কেউ সুযোগ পাবে না। এটাই কোটার নিয়ম। গত কয়েক বছরে ডাক্তারিতে সংখ্যালঘু ওবিসি-এ বহু ছেলে-মেয়ে সুযোগ পেয়েছে এই ওবিসি কোটার সুযোগ নিয়ে। একদিকে যখন পশ্চিম এশিয়ার টাকায় সব ধরনের কোচিং দেওয়া হচ্ছে এই সংখ্যালঘুদের, তখন আমাদের জেনারেল, এসসি এসটি ছেলে- মেয়েদের পড়াচ্ছে পিছনের দরজা দিয়ে ঘুষ দিয়ে টেট-এ সুযোগ পাওয়া শিক্ষকরা। আগামী দিনে এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এই সংরক্ষণকে হাতিয়ার করে যদি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সুযোগ পেয়ে বেঙ্গল ক্যাডারে যোগ দেয়, তবে ১৯৪৬-এর পুনরাবৃত্তি হতে সময় লাগবে না। দেশভাগের সময়ে কিন্তু জাতের বিচার করে ঘাড় ধাক্কা দেওয়া হয়নি। হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে। তাই এই ইস্যু শুধু মণ্ডল কমিশনে নাম থাকা সত্ত্বেও বঞ্চিত হওয়া ওবিসিদের নয়। এটা সব হিন্দু বাঙ্গালির সমস্যা।

এবার আসি, EWS অর্থাৎ আর্থিকভাবে অনগ্রসর বাকি গোষ্ঠী অর্থাৎ জেনারেল কাস্টের ছেলে-মেয়েদের প্রতি কেমনভাবে অন্যায় এবং অবিচার চালাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৭ জানুয়ারি ২০১৯, মোদীজী ১০ শতাংশ সংরক্ষণের বিল পাশ করেন আর্থিকভাবে দুর্বল ব্রাহ্মণ, কায়েত, ক্ষত্রিয় এবং বানিয়া-সহ বাকি জেনারেল কাস্টের দরিদ্র মানুষের জন্য। ৭৫০ বছরের পরাধীনতা এবং ৪৪ বছরের ভুল নেহরুভিয়ান মিশ্র অর্থনীতির দৌলতে দারিদ্র্য গ্রাস করেছে সব শ্রেণীর মানুষকে। সরকার এই সুবিধা পেতে যথারীতি কিছু মানদণ্ড বেঁধে দিয়েছে। আর এখানেই দুর্নীতিগ্রস্ত এবং সনাতন ধর্মবিরোধী কিছু সরকারি আধিকারিক বাঙ্গালি হিন্দু ছেলে-মেয়েদের বঞ্চিত করার সুযোগ নিচ্ছে। তারা অবশ্য সংখ্যালঘুদের খুব সহজেই EWS সংরক্ষণ পাইয়ে দিচ্ছে।

> **জাতপাত ভিত্তিক জনগণনা চেয়ে মানুষকে খেপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে কংগ্রেস এবং সহযোগী দল। উদ্দেশ্য একটাই। পশ্চিমবঙ্গ মডেল প্রয়োগ করে সারা দেশের এক বিশেষ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে প্রশাসন, সংবাদমাধ্যম, শিক্ষাজগৎ ও বিনোদন জগতে জায়গা করে হিন্দুদের প্রতি ঘোর অন্যায় ও অবিচার করা।**

কীভাবে?

বটব্যাল বা সেনাপতি ব্রাহ্মণ ঘরানা হলেও, তাঁদের সংখ্যা কম। আধিকারিক বলছে, আপনি যে ব্রাহ্মণ তার প্রমাণপত্র নিয়ে আসুন। কিংবা সরকার বা মজুমদার বা বিশ্বাস, যা পদবি নয় উপাধি, তাদের বলা হচ্ছে কায়েত প্রমাণ করতে। কোনোদিন কোনো সরকার বামুন বা কায়েতকে প্রমাণপত্র দিয়েছে কি? অথচ সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে নামই যথেষ্ট। যারা ওবিসি-এ বা বি শংসাপত্র পেয়ে যাচ্ছে।

তাহলে এক কথায় কী দাঁড়ালো?

একদিকে মাহিষ্য, বানিয়া, তিলি বা সদগোপদের মধ্যে যারা ওবিসি পাওয়ার যোগ্য হলেও সেকুলার পশ্চিমবঙ্গে জন্মানোর পাপের ফল হিসেবে ওবিসি শংসাপত্র পাননি। তাঁরা কীভাবে প্রমাণ করবেন যে তারা কোনোরকম কোটা পান না? ওবিসি শংসাপত্র পেলে তারা কেন ইডব্লুউএস শংসাপত্র চাইবেন? আর বামুন, কায়েত, বৈদ্য, উগ্রক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়, বানিয়াদের এক অংশ যাদের মণ্ডল কমিশনে নামই ছিল না, তারাও বারবার সরকারি দপ্তর থেকে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোনো সরকারি বাবু আবার বাড়ির নকশা চাইছে। গ্রামের বা ছোটো শহরের চালার বাড়ি কিংবা ছোটো বাড়ির কয়জনের নকশা আছে? পঞ্চায়েত কবে থেকে টালির বাড়ির নকশা চায়?

তাহলে সেকুলার শাসক দলগুলির অন্যায় এবং অবিচার কী দিচ্ছে হিন্দু সমাজকে?

বাঙ্গলার পক্ষে বলে দাবি করা রাজনৈতিক দলগুলির আশীর্বাদে বামুন, কায়েত, বৈদ্য, সদগোপ, বানিয়া, তিলি, আগুরি, গোয়ালা, মাহিষ্যদের গরিবরা আইআইটি, আইআইএম বা অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের পড়াশোনা বা রেল, ব্যাংকের প্রাপ্য চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন দশকের পর দশক। কলকাতা থেকে কোচবিহার রেল স্টেশন, ব্যাংক কিংবা পোস্টঅফিসে কমবয়সি অফিসার বা অফিস হেড মাত্রেই বিহারি কিংবা ওড়িয়া বা দক্ষিণী। আর যারা এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখছে তারা নিজেদের 'বাংলাপক্ষ' বলে দাবি করছে এবং সুবিধা করে দিচ্ছে বাংলাভাষীদের যারা নিজেদের বাঙ্গালি বলে না। যাদের একমাত্র পরিচয় তাঁদের ধর্ম। আর এই মডেল সারা ভারতে চালু করার জন্যই নতুন করে জাতপাত ভিত্তিক জনগণনা চেয়ে মানুষকে খেপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে কংগ্রেস এবং সহযোগী দল। উদ্দেশ্য একটাই।

পশ্চিমবঙ্গ মডেল প্রয়োগ করে সারা দেশের এক বিশেষ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে প্রশাসন, সংবাদমাধ্যম, শিক্ষাজগৎ ও বিনোদন জগতে জায়গা করে হিন্দুদের প্রতি ঘোর অন্যায় ও অবিচার করা। □

পশ্চিমবঙ্গে প্রবহমান দুর্দম দুর্নীতি

খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গে প্রবহমান দুর্নীতির শিরোনামের বিশেষণ খুঁজতে গিয়ে ওই নির্লজ্জ, দুর্মতি, দুর্বৃত্তদের জন্য প্রযোজ্য জুতসই শব্দ খুঁজে না পেয়ে 'দুর্দম' শব্দটি ব্যবহার করতে হলো! জানি না মানুষ বেশধারী বাঙ্গালি পরিচয়ের ওই সমস্ত কীটদের জন্য তা যথার্থ কিনা! বাঙ্গালির গর্ব নীরদ সি চৌধুরী বাঙ্গালি চরিত্রের যে রূপ দেখে 'আত্মঘাতী বাঙ্গালি' নিয়ে খেদ ব্যক্ত করেছিলেন, তিনি বেঁচে থাকলে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের দুর্বৃত্তায়ন ও দুর্নীতির চেহারা দেখলে লন্ডনবাসীর কাছে তাঁর বাঙ্গালি পরিচয়টাই গোপন করতেন কিনা জানি না। তবে এটা জানি যে প্রবাসী বাঙ্গালিদের অনেকেই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, নির্বাচনে পেশীশক্তির ব্যবহার এবং নির্বাচন পরবর্তী হিংসা তথা পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির খবরে বাঙ্গালি পরিচয়টা গোপন না করলেও, অন্তত আগবাড়িয়ে বাঙ্গালি পরিচয়ে উল্লসিত হবেন না।

যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী পশ্চিমবঙ্গে লাগামহীন দুর্নীতির সাফাইয়ে ভারতের অন্য রাজ্যের দুর্নীতির উদাহরণ টানেন বা হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে নীরব মোদী, বিজয় মালিয়াদের বেপাত্তা হওয়ায় গল্প ফাঁদেন, তাঁরা যে আত্মবিক্রিত, বৃত্তিভোগী, সরকার পোষিত বুদ্ধিজীবী, তা বুঝবার মতো বিবেচনা সাধারণের আছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গের মতো প্রতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে অকল্পনীয়। ব্যাংকের টাকা অনাদায়ী রেখে পালিয়ে যাওয়াটায় সরকারের ভূমিকা নগণ্য। সরকার ওই সমস্ত পলায়নপর দুষ্কৃতীদের দেশে প্রত্যার্পণে চেষ্টা না করলে দোষ দেওয়া যায়, তাছাড়া যে কোনো ব্যাংক লোন পর্যাপ্ত (পুরাপুরি না হলেও) নিরাপদ থাকে, ব্যাংকগুলি তা উদ্ধারের চেষ্টাও করে। অবশ্য প্রতারণা বা জালিয়াতির ব্যাপার থাকলে আলাদা কথা।

তৃণমূল দল এবং সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তকারী সংস্থাগুলি কোনো পদক্ষেপ করলেই তা কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র বলে চিৎকার করা হয়। এমনকী দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ বা কোনো পদক্ষেপ করলে, এমনকী কারাবন্দি করলেও তাদের মাসের পর মাস মন্ত্রীসভায় রেখে দেওয়া হয়— যেমনটি ঘটেছিল মদন মিত্রের ক্ষেত্রে। আবার জেলবন্দিদের জেল মুক্তি হলে বীরের সংবর্ধনা দেওয়ার আগাম ঘোষণা করে কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত রাখা হয়, অথচ ওই বীরসিংহরা ইডি-সিবিআইয়ের হস্তগত হলেই বুকে হাত দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে— সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের মদতে হাজতবাস এড়িয়ে যাওয়ার জন্য। শোনা যায়, এসএসকেএম হাসপাতালে ভিআইপি কেবিনে সরকারি খরচায় হরদম খানাপিনা করেন। মন্ত্রীসভার দ্বিতীয় ব্যক্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবীর বাড়িতে ২৮ কোটি টাকা উদ্ধার হলেও তৃণমূল নেত্রী বলছেন পার্থ নির্দোষ। শুধু পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাপারেই নয়, দলের ও প্রশাসনের জেলে যাওয়া অনেকের ক্ষেত্রেই মুখ্যমন্ত্রী পাশে থাকায়, তদন্তের গতি শ্লথ করেছে এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে চাপে রাখছে। অভিযোগকারীও তদন্তে সহযোগিতা করছেন না, সরকার তাদের রক্ষা করবেন এই ভয়ে। অপরপক্ষে, অভিযুক্তরা যাতে মুখ খুলে রাঘব-বোয়ালদের না জড়ায়, সে কারণেই কৌশলগত ভাবে অভিযুক্তদের পাশে থাকছে সরকার। নানা ভাবে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান বনদপ্তরের ক্যাবিনেট মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বাড়িতে রেশন দুর্নীতির মামলায় ইডি অভিযান চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রীর চপল ও বালখিল্য অভিযোগ— 'ইডি বালুর বউয়ের শাড়ির ছবি তুলছে' জাতীয় মন্তব্য তদন্তকে লঘু করারই চেষ্টা ছিল, যদিও তাতে শেষ রক্ষা হয়নি। নারদায় উৎকোচ গ্রহণের পর্বেও দলীয় নেতা-মন্ত্রীদের রক্ষার জন্য ম্যাথু সামুয়েলের ভিডিয়োটি ফেক বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফরেনসিক পরীক্ষার পরে ভিডিয়োটি সঠিক বলে প্রমাণিত হওয়ায়, তিনি ঢোক গিলে দলীয় তহবিল সংগ্রহের গল্প ফাঁদেন— যদিও মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই জানতেন ভিডিয়োটি সঠিক। মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতিগ্রস্তদের এবং দুর্নীতির প্রতি মনোভাবেই প্রতিফলিত হয়, তিনি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন সজ্ঞানে।

> **অভিযুক্তরা প্রভাবশালী হলে নানা অছিলায় তারা তদন্ত এড়িয়ে যাওয়া ছাড়াও তদন্তকারী সংস্থার উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে, এমনকী ক্ষমতা পেলে দেখে নেওয়ারও হুমকি দেয়।**

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস বা বাম রাজত্বে ছোটোখাটো দুর্নীতির ঘটনা সামনে এলেও তা সর্বত্রগামী এবং সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত ব্যাপৃত ছিল না। স্কুল শিক্ষক নিয়োগে বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগে দলীয় লোকদের অগ্রাধিকার বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনিলায়নের নামে দলীয় ভাবাদর্শী উপাচার্য নিয়োগের ঘটনা ঘটলেও, তাঁরা কেউ

দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন না বা একেবারেই অযোগ্য ছিলেন না। এখন পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের সর্বোচ্চ (আইএএস বাদে) নিয়োগকারী সংস্থা ডব্লুউবিসিএস কমিশনও দুর্নীতির বাইরে নয়। কমিশন সদস্য— জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের দাদাও নাকি ইডির স্ক্যানারে। ভাবছি, ১৯৮০-তে আমরা যখন ডব্লুউবিসিএস (ইএক্স) হিসেবে নির্বাচিত হই— তখন এমন ব্যবস্থা থাকলে, কোনো সুপারিশ ছাড়া এই প্রতিবেদক নির্বাচিত হতেই পারত না। দুর্নীতির জাল স্কুল সার্ভিস কমিশন বা কলেজ সার্ভিস কমিশনেও ছড়িয়ে পড়ে নি তো? তবে শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর— মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক সংসদের অধিকাংশ কর্মকর্তা, এমনকী কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ঘুষকাণ্ডে জেলে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার কঙ্কাল বেরিয়ে এসেছে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা মন্ত্রী পরিষদের দ্বিতীয় পদাধিকারীর জেলে থাকা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অযোগ্য রাজনীতিকদের উপাচার্য নিয়োগের বার্তা কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। এ কারণেই কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলি আজ আর ভারতের এবং বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের গন্তব্য নয়, বরং পশ্চিমবঙ্গের মেধাবীরাই আস্থা রাখছেন বেঙ্গালুরু, দিল্লির বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর। যদিও শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের অবনমনের শুরু বামফ্রন্টের রাজত্বের শেষের দিকেই। ইংরেজি বর্জনের মধ্য দিয়ে, আর অন্তর্জলি প্রাপ্তি ঘটেছে বর্তমান শাসনে। শিক্ষায় রাজনীতির রমরমা বিশেষ করে লাগামহীন ছাত্র রাজনীতির প্রভাব, টাকা নিয়ে ভর্তি, কলেজে অধ্যক্ষের ক্ষমতা হ্রাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনে হস্তক্ষেপ, প্রাথমিক শিক্ষায় যোগ্যদের বাদ দিয়ে টাকার বিনিময়ে নিম্নমেধার প্রার্থীদের নিয়োগ (আদালতের রয়ে প্রমাণিত) পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

শিক্ষায় দুর্নীতি ছাড়াও, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগ, পৌরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি, কয়লাপাচার, গোরুপাচার, সোনা পাচার, আমফানে বিধ্বস্ত গরিব মানুষের ঘরের জন্য বরাদ্দ টাকা পঞ্চায়েতের নেতা-নেত্রীদের মধ্যে বণ্টন, ত্রাণ সামগ্রী— ত্রিপল খোলা বাজারে বিক্রি, ১০০ দিনের টাকায় জব-কার্ডধারীদের থেকে কমিশন, ইত্যাদি অভিযোগের তির তৃণমূল নেতা বা যুব তৃণমূলের শীর্ষ পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে। এদের কেউ দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন, আবার কেউ সুযোগ খুঁজছেন। দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির জঞ্জাল ধাপার জঞ্জালকেও উপচে গিয়েছে। অথচ এই দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বা রোষ বর্ষিত হচ্ছে না, শুধু রাজনীতির চাপান-উতোর ছাড়া। এর কারণ কী? বাঙ্গালি কি দুর্নীতি রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেল, না মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ-মধ্যবিত্তদের এই দুর্নীতি সরাসরি স্পর্শ করছে না? না এর জন্য বাঙ্গালি সংস্কৃতিতে সহনশীলতা এবং ভীরুতা কিয়দংশে দায়ী? 'শ্রী'ভূষিত বৃত্তিভোগী সুশীল সমাজের গরিষ্ঠাংশের নীরবতা অনুমেয়, সাধারণের একাংশ ডোলপ্রাপ্ত হওয়ায় তারাও চুপ। বিত্তবানদের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষা ও চাকরির খোঁজে অন্য রাজ্যে বা বিদেশে। নিম্নবিত্তদের ছেলে-মেয়েরা আধা-পড়াশোনা করেই স্টার মার্কস পাওয়ায় অভিভাবকরা খুশি, তাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে উঠছে না। আর নাগরিকদের এই নির্লিপ্ততায় দুর্নীতিবাজরা আরও উৎসাহিত, বেপরোয়া— করছি, আরও করবো মনোভাব। বরং গলা উঁচিয়ে বলছেন, ওরা হাজার হাজার টাকা লুটছে, আর আমাদের লোকেরা লক্ষ টাকা নিলেই ইডি, সিবিআই লেলিয়ে দিচ্ছে? কাজ করতে গেলে একটু ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে— তা নিয়ে হইচই তৃণমূল নেত্রীর অপছন্দ। অর্থাৎ দুর্নীতিই হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নতুন সংস্কৃতি— আপনি মানুন আর না-মানুন।

দুর্নীতির এই অপসংস্কৃতিকে রূঢ়ভাবে তিরস্কার করতে হবে, প্রয়োজনে এদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, এ ব্যাপারে ছাত্র-যুবদের নেতৃত্ব দিতে হবে, রাজনীতির রং না দেখে। সমস্ত ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে ছিঃ ছিঃ করছে, প্রবাসী বাঙ্গালিরা লজ্জায় মুখ লুকাচ্ছে। এ জিনিস চলতে দেওয়া যায় না, আমাদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মেরুদণ্ড সোজা রাখতে তথা বাঙ্গালি পরিচয়ে গর্বিত হওয়ার জন্য। অভিযুক্তদের হক কথা, দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তারা নির্দোষ। তাদের নিয়ে এত হইচই-এ তাদের সামাজিক মর্যাদা নষ্ট করছে। দুর্নীতি প্রমাণ হলে কেউ কেউ আত্ম-বলিদানের মতো মহান নিদর্শন স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন— এরপর তো কথা থাকে না। কথা ওঠার একটাই কারণ তা হচ্ছে অভিযোগের বিরুদ্ধে তদন্ত না হলে দোষী বা নির্দোষ প্রমাণ হবে কীভাবে? সেই তদন্ত আটকাতে লোয়ার কোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত দৌড়ঝাঁপ কেন? এটা কি বিচার প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে বিচার প্রলম্বিত করার প্রচেষ্টা নয়? কারণ আমরা জানি 'Justice delayed, justice denied.' দুর্নীতির টাকায় যুগের পর যুগ আরাম, বিলাস ও ক্ষমতা ভোগ করে যাওয়ার ধান্দায় সর্বত্রই তদন্ত ঠেকানোর প্রয়াস।

ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে দুর্নীতিবাজদের রমরমার অন্যতম কারণ বিচার বিভাগের দীর্ঘসূত্রিতা— অবশ্য এর পিছনে তদন্তকারী সংস্থার অপদার্থতা এবং অদক্ষতা কিয়দংশে দায়ী, এ বিষয়ে ইদানীংকালে ইডি বা সিবিআইয়ের মতো পেশাদারি সংস্থাকে বিচার বিভাগের ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়। অভিযুক্তরা প্রভাবশালী হলে নানা অছিলায় তারা তদন্ত এড়িয়ে যাওয়া ছাড়াও তদন্তকারী সংস্থার উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে, এমনকী ক্ষমতা পেলে দেখে নেওয়ারও হুমকি দেয়। তবে ইডি-সিবিআইয়ের মতো পেশাদারী সংস্থা যদি এ সমস্ত কারণে তদন্তে ভয় পায় বা পিছিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে তা হবে দেশের পক্ষে চরম দুর্ভাগ্যের। বরং দুর্নীতির অভিযোগের প্রথম পর্যায়ই অভিযুক্তদের সম্ভাব্য সব ডেরায় হানা দেওয়া উচিত, নচেৎ তথ্য প্রমাণ লোপাট হয়ে যাবে। অভিযুক্তরা যদি সরকারি দলের প্রভাবশালী হয় তাহলে সংস্থার কাজ আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অপরাধী সাজা না পেলে মার খাবে উন্নয়ন— ভেঙে চুরমার হবে সমাজ-সংস্থা, সংস্কৃতি। বঙ্গ ও বাঙ্গালির পশ্চাদগামিতা রোখা যাবে না।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভারতের জাতীয় জাগরণ

(উন্মেষ পর্ব)

অভিজিৎ ভট্টাচার্য

নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে যখন ভাবগত, কৃষ্টিগত সংস্কৃতিগত, সাহিত্যগত এক ঐক্যবোধ জাগ্রত হয় এবং তার জন্য তারা গর্বিত হয় তখনই সংশ্লিষ্ট দেশে জাতীয়তাবোধের পুণ্য জাগরণ ঘটে। লয়েড ক্র্যামার জাতীয়তাবাদকে একটি ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। জাতীয়তাবাদ একটি রাজনৈতিক আদর্শ, জাতীয় দেশ গঠনের প্রথম সোপান।

অনেকেই মনে করেন রোমান সাম্রাজ্য ও পোপের ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রতিবাদের ভিত্তি ভূমিতেই ইউরোপে জাতীয়তাবাদের বীজ রোপিত হয়। ম্যাৎসিনী, গ্যারিবল্ডি ও কাউন্ট কাভুর এই তিন দেশপ্রেমিকের যোগ্য নেতৃত্ব এবং জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ইতালিতে জাতীয় জাগরণ শুরু করলেও একথা সত্য যে ফরাসি বিপ্লব ১৭৮৯-এর তরঙ্গ সমগ্র ইউরোপের ঘুণ ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে মুচড়ে নতুন ভাবধারা প্রবাহিত করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের মুক্ত বাতাস বইতে শুরু করে। এই বিপ্লবের আলোয় আলোকিত ম্যাৎসিনির উক্তি ছিল— 'United Italy can only be founded by Italian people.' আবার অনেকের ধারণা ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে পোলান্ডের বিভক্তীকরণের মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদের পথ চলা শুরু।

তবে ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে, ভারতের জাতীয়তাবোধ আরও অনেক গভীরে। ইতিহাস গ্রন্থে যেসব সভ্যতা যেমন, মিশরীয় সভ্যতা, মায়া সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, গ্রিক, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা মানব জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে, সেখানে ভারতীয় সনাতন হিন্দু সভ্যতা আজও স্বমহিমায় প্রবহমান। কেন? এর একটাই কারণ ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা। 'এই সনাতন হিন্দুধর্মই ভারতীয় যোদ্ধাদের এ যাবৎকাল শক্তি জুগিয়ে এসেছে' ('যোদ্ধা ভারতবাসী'-অমলেশ মিশ্র) এবং আজও আসছে। আমাদের ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উৎসভূমি ছিল তক্ষশীলা মহাবিদ্যালয়। এই মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র ও পরবর্তীতে অধ্যাপক ছিলেন চাণক্য। প্লুটার্কের রচনা থেকে জানা যায় যে, ভারত আক্রমণকারী আলেকজান্ডার (খ্রি:পূর্ব ৩২৬-৩২৫) এক সূত্র মারফত জানতে পারেন সংসার ত্যাগী ব্রাহ্মণ ও সাধুসন্তদের বিরাট প্রভাব রয়েছে সাধারণ মানুষদের উপর। এই সাধারণ মানুষরাই ছিলেন ভারতবর্ষের প্রধান চালিকাশক্তি। দেশ জয়ের নেশায় মদমত্ত আলেকজান্ডার তখনই সিদ্ধান্ত নেন, ওই সব ব্রাহ্মণ ও যোগীদের শিরশ্ছেদ করা হবে। ডেকে পাঠালেন তাঁদের, কিন্তু ব্রাহ্মণ-যোগীরা যাননি। গ্রিকরা তাঁদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন কেন তাঁরা গ্রিকদের বিরুদ্ধে প্রচার করছেন? জবাবে যোগীরা বলেছিলেন— সম্মানের সঙ্গে বাঁচব আর যদি মৃত্যুকে বরণ করতেই হয় তবে, আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্যই মরব। অর্থাৎ বলা যায়, সেই প্রাচীন ভারতে যে প্রথম বিদেশি আক্রমণ ঘটেছিল তার বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ ও জাতিকে জাগ্রত করে ঐক্যবোধের বিস্তার ঘটেছিল তার প্রেরণদাতারা ছিলেন ওই সব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও যোগীরা, যাঁরা ছিলেন পুরোপুরি আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। এক বিবরণ থেকে জানা যায়, আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণকালে মাসাগা নামে এক স্থানের সাত হাজার জনকে বন্দি করে প্রস্তাব দেন, হয় গ্রিক সেনাদলে যোগ দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর নয়তো তাদের ক্রীতদাস করে নিয়ে যাওয়া হবে। গ্রামবাসীরা সিদ্ধান্ত নিল তারা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না আবার ক্রীতদাসও হবে না। এই সংবাদ পেয়ে রক্তলোলুপ আলেকজান্ডার তাদের এক রাতেই ঘুমন্ত অবস্থায় মেরে ফেলেন।

এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁর 'Early History on India' নামক গ্রন্থে লেখেন ওই খণ্ড জাতি অতি সহজেই জাতীয় অসম্মানের বিনিময়ে বেঁচে থাকতে পারতেন, কিন্তু তা না করে তাঁরা মৃত্যুবরণ করে নিলেন। বুঝতেই পারা যায় আজ থেকে প্রায় দুই হাজার তিনশো বছর আগে থেকেই ভারতবাসী কত গভীরভাবে দেশমাতৃকাকে ভালোবাসতো— তাঁদের জাতীয়তাবোধ মৃত্যুর ফরমানকে ভয় পেত না।

প্রাচীন ভারতে 'খণ্ড ছিন্ন' বিধ্বস্ত ভারতভূমিকে এক সূত্রে গ্রথিত করতে যিনি সবথেকে বেশি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন ইতিহাস খ্যাত চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত। চাণক্য এক শক্তিশালী সার্বভৌম দেশ গঠনের জন্য তৈরি করলেন নিজ মানসপুত্র রূপে গ্রামের এক প্রান্তিক ছেলে চন্দ্রগুপ্তকে। এই দুই গুরু-শিষ্য সমগ্র ভারতবর্ষে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করে ধাপে ধাপে তার রণকৌশল তৈরি করেন। এই রণকৌশলের প্রথম ধাপ ছিল ৩২১ খ্রি: পূর্বাব্দে এক সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী গঠন।

চাণক্য ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে মগধকে কেন্দ্রবিন্দু করে এক সার্বভৌম ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ নির্মাণের পথ তৈ‍ি করেন। শিষ্যকে মন্ত্র দিলেন— 'প্রজার সুখেই রাজার সুখ, প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল।' এই মন্ত্রকে হাতিয়ার করেই মগধের অত্যাচারী, প্রজা দলনকারী রাজা ধননন্দকে উৎখাত করেন। এরপর উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে বিদেশি শক্তি গ্রিকদের বিতারণ করেন (৩২১-৩১৭ খ্রি: পূর্বাব্দ)। ঐতিহাসিক জাস্টিন বলেন, 'মুক্তি যুদ্ধের নায়ক ছিলেন স্যান্ড্রোকোট্টাস বা চন্দ্রগুপ্ত।' আবার গ্রিক ঐতিহাসিক স্ট্রাবোর রচনা থেকে জানা যায়, সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে এক সন্ধি করে কাবুল কান্দাহার, ইরাক ও বালুচিস্তান চন্দ্রগুপ্তকে উপহার দেন আর চন্দ্রগুপ্ত দেন পাঁচশো হাতি। এইভাবেই চন্দ্রগুপ্ত নিজ বাহুবলে ছয় লক্ষের এক শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করে উত্তর-পূর্বের পারস্য শাসনের সীমানা, পশ্চিমদিকে আরব সাগর আর দক্ষিণে মহীশূর-মাদ্রাজ পর্যন্ত এক বিশাল সার্বভৌম সাম্রাজ্য গঠন করেন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক স্মিথ বলেন— 'দুই হাজার বছর আগে প্রথম ভারতীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতের যে বৈজ্ঞানিক সীমান্তের অধিকারী হয়েছিলেন মুঘল বা ইংরেজরা সামগ্রিকভাবে তা অর্জন করতে পারেন নি।'

আজ থেকে প্রায় দুই হাজার তিনশো বছর আগে প্রাচীন ভারতের স্বপ্নের নায়ক, দেশের অগ্নিময় স্থাপক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নিজ সমর কুশলতার জোরেই মগধের রাজমুকুট মাথায় তুলে নেন। একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতের পরবর্তী ইতিহাস এই গুরু-শিষ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই রষ্ট্রবাদী ভাবধারায় পথ চলা শুরু করে এবং আজও সেই ভাবধারা অব্যাহত। □

ধর্মান্তরের চক্রান্ত বন্ধ হোক

পৃথিবীর সৃষ্টির আদিলগ্নে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন ছিল না। মানুষ তখন বাঁচার প্রয়োজনে, কাজের জন্য একসঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করত। গোষ্ঠী জীবন থেকে সমাজ গড়ে তুলেছিল। সমাজকে চালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন রকম রীতিনীতি, সংস্কার, চালু করেছে। প্রাচীনকালে সমাজে কাজের ভিত্তিতে মানুষের বিভাজন ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। কালের নিয়মে মানুষ ক্রমশ আধুনিক হয়েছে, সভ্য সমাজ গড়ে তুলেছে। ক্ষমতা দখল ও ধনসম্পদ লুঠের জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে। ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে বিভাজন হয়েছে, সমাজ গড়ে ওঠার অনেক পরে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মত ও পন্থের মানুষ বসবাস করেন। এমনকী ইসলাম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ধর্মের মানুষের পৃথক দেশ আছে। একমাত্র হিন্দু ধর্মের মানুষের পৃথক কোনো দেশ নেই। যদিও সারা বিশ্ব জুড়েই এই ধর্মের মানুষ বসবাস করেন।

আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে সব ধর্মের মানুষের সমান ভাবে বসবাস করার অধিকার আছে। আর এই সুযোগের জন্য যে সব ধর্মের মানুষের সংখ্যা খুব কম, তারা সনাতন হিন্দু মানুষদের টার্গেট করছে। লাভ জেহাদের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের মেয়েদের বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কাজ মূলত মুসলমান সম্প্রদায়ের যুবকরা করে থাকে। সনাতন হিন্দু ধর্মের মেয়েদের প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে বিয়ে করে নিজের ধর্মে দীক্ষিত করছে। এই জালে অনেক হিন্দুধর্মের মেয়ে ভিন্ন ধর্মী বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবকদের সঙ্গে প্রেমের জালে জড়িয়ে যাওয়ার আগে দশবার ভাবা উচিত। এছাড়াও বর্তমানে আমাদের রাজ্যে আরেক একটি সম্প্রদায়ের মানুষ গরিব, কম শিক্ষিত, খেটে খাওয়া মানুষের সেবা, দান, উন্নয়ন কাজের নাম করে তাদের মগজ ধোলাই করছে। বিশেষত জনজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষকে তারা টার্গেট করছে। যিশুর বাণী পড়লে, যিশুর প্রার্থনা করলে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, রোগ, জ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এইরকম মগজ ধোলাই করে তাদের খ্রিস্টান রিলিজিয়ন গ্রহণ করতে মোটিভেট করছে।

আমাদের রাজ্যের পুলিশ, প্রশাসনের অন্তরালে এই ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান সরকারের আমলে হিন্দুধর্মের মানুষের সংখ্যা ক্রমশ কমছে কিন্তু তাদের সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে। একদিকে অনুপ্রবেশ, অন্যদিকে ধর্মান্তরের ঘটনা, অনিয়ন্ত্রিত ভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধি। তাই সনাতন ধর্মের মানুষের এইবার চিন্তাভাবনা করার সময় এসেছে ধর্মের ভিত্তিতে একমতাদর্শে বিশ্বাসী হতে হবে। এমন একটি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থাকতে হবে যারা সংখ্যালঘু তোষণ করবে না, হিন্দু সমাজের মানুষদের শোষণ করবে না। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যেমন ৩০ শতাংশ ভোটের ২৫ শতাংশ শাসকদলের ভোটব্যাংক। তেমনি হিন্দুদের মানুষদেরও একজোট হওয়া প্রয়োজন। হিন্দু ধর্মের মানুষের সুরক্ষা, অস্তিত্ব, শান্তিতে বসবাস করার জন্য ধর্মান্তরের ঘটনা রোধ করতে হবে। পুলিশ ও প্রশাসনের সহযোগিতা না পেলে হিন্দুধর্মের মানুষের জোটবদ্ধ হয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

—**চিত্তরঞ্জন মান্না,**
চন্দ্রকোনা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

আপনি কি এই আই.এন.ডি.আই.এ. জোটের হাতে দেশ তুলে দিতে চান?

(১) চাকরি, বালি, কয়লা, গোরু ও গরিবের রেশনের চাল চুরিতে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল।

(২) পশুখাদ্য দুর্নীতি, চাকরির বদলে জমি কেলেঙ্কারিতে বিহারের লালু, রাবড়ি ও তেজস্বী যাদবের আরজেডি পার্টি।

(৩) বিহারের নীতীশ কুমারের ভাগলপুরের নতুন ব্রিজ ভেঙে পড়া কেলেঙ্কারি,

(৪) উত্তরপ্রদেশের মুলায়ম-অখিলেশের আয়ুর্বেদিক কেলেঙ্কারি এবং মায়াবতীকে ঘর অন্ধকার করে অসম্মানিত করা— সমাজবাদী পার্টি।

(৫) শতাব্দীপ্রাচীন কংগ্রেসের সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধী প্রকাশনা সংস্থার সম্পত্তি অবৈধ ভাবে হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত। এদের ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ৫০৮ কোটি টাকার ঘুষকাণ্ডের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

(৬) মহারাষ্ট্রের এনসিপি জমি, চিনিকল ও সমবায় কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত।

(৭) সিপিআইএম তাদের তাদের শাসনে পশ্চিমবঙ্গে মানুষ খুনের রাজনীতি এবং কেরালায় নানাবিধ দুর্নীতিতে জর্জরিত। এরা হামাস-সহ জঙ্গি সংগঠনের সমর্থক। এই বামপন্থীরা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মুসলমান তোষণ ও হিন্দু বিরোধিতা করছে।

(৮) ঝাড়খণ্ডের--- ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রধান, মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন নিজেই খনি ঘোটালায় অভিযুক্ত।

(৯) দিল্লি, পঞ্জাবের, আম আদমি পার্টি একটি পরিপূর্ণ দুর্নীতিগ্রস্ত দল। এদের দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে মদ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে জেলের ভাত খাচ্ছে। তার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে বলে সুপ্রিম কোর্ট তার জামিন অগ্রাহ্য করেছে। যেহেতু সবটা মুখ্যমন্ত্রীর জ্ঞাতার্থেই হয়েছে, তাই সঙ্গত কারণেই ইডি অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গত ২ নভেম্বর ডেকেছিল। তিনি সেখানে না গিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর পঞ্জাব সরকারের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্যের পাচারের সঙ্গে যোগসাজসের দিকে আঙুল উঠেছে। এছাড়া আরও খুচরো অনেক অভিযোগ রয়েছে।

ফঃ ৩

(১০) এছাড়া ওখানে আছে অপদার্থ সিপিআই, সিপিআই-এমএল (লিবারেশন), ফরোয়ার্ড ব্লক, আরএসপি এবং মুসলিম লিগ। এছাড়াও আছে নামগোত্রহীন আরও কিছু দল। আসলে এই I.N.D.I.A. জোটের দলগুলি চায় চুরির গ্যারিন্টি। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চান না দেশের জনগণের একটাও পয়সা নষ্ট হোক, চুরি হোক। তাই ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে লড়াই সৎ এবং অসতের লড়াই। ন্যায় ও অন্যায়ের লড়াই। আপনাকে ঠিক করতে হবে, আপনি কাকে সমর্থন করবেন।

—**শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

দুর্গাপূজায় মাইক বন্ধের ফরমান

দুর্গাপূজা শেষ হলো। এবার দেশে সাড়ম্বরে শান্তিপূর্ণভাবে পূজা হয়েছে। এজন্যে সরকারকে ধন্যবাদ। আর সরকারকে ধন্যবাদ দিতে হবে কেন, এটি সরকারের দায়িত্ব। তবু ধন্যবাদ দিতে অসুবিধা নেই। দুর্গাপূজায় শান্তির প্রশ্ন ওঠে কেন? ইদে তো ওঠে না! ২০২২-এর পূজা শান্তিপূর্ণ হয়েছিল। ২০২১-এ অশান্তির আগুনে ১৮টি জেলায় হিন্দুরা আক্রান্ত হয়েছিল। রানা দাশগুপ্ত বলেছেন, সরকার চাইলে পূজা শান্তিপূর্ণ হবে, না চাইলে হবে না। সরকার চেয়েছে তাই পূজা শান্তিপূর্ণ হয়েছে। অনেকদিন আগে ভারতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনার আমলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি কেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমার সরকার দাঙ্গা চায়নি'। ২০২২-২০২৩-এ বাংলাদেশ সরকার শান্তিপূর্ণ পূজা চাইল, তাই অশান্তি হয়নি। এর মানে কি রামু থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত হিন্দুর ওপর যত আক্রমণ হয়েছে সরকার তা চেয়েছিল? বলা কঠিন, তবে ১৯৯২ সালে দাঙ্গা এরশাদ সরকার করিয়েছে তা সবার জানা। বাংলাদেশে মূর্তিভাঙা জানান দেয় দুর্গাপূজা এসেছে। এবারও বেশ ক'জায়গায় ভেঙেছে, তবে ব্যাপক নয়? পূজা এলে মিডিয়া প্রায়শই হেডিং করে, 'রাতের অন্ধকারে প্রতিমা ভাঙচুর'। সামাজিক মাধ্যমে একজন ঠাট্টা করে বলেছেন, 'রাতে ভেঙেছে, দিনে তো ভাঙেনি'? দিন আসছে, দিনেও ভাঙবে। ভারত চাঁদে রকেট পাঠিয়েছে, এ সংবাদ শুনে পাকিস্তান বলেছে, 'আমরা সূর্যে পাঠাবো'। একজন বললেন, সূর্য তো প্রচণ্ড গরম, সেটা কীভাবে সম্ভব? পাকিস্তান বলেছে, 'সেজন্যেই আমরা রাতে পাঠাবো'। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে এখন ধর্মের বাড়বাড়ন্ত, সুতরাং মূর্তি ভাঙবে, সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হবে, এটিই স্বাভাবিক। বাংলাদেশ সরকার প্যালেস্তাইনিদের জন্যে শোক পালন করল, অথচ সেদিন দুর্গাপূজা ছিল। এবার নিউইয়র্কে ২৩টি দুর্গাপূজা হয়েছে। বাংলাদেশে হিন্দু কমছে, কিন্তু পূজা বাড়ছে। হিন্দু কমছে বললে অনেকে 'মাইন্ড' করেন!

ইসলামিক ফাউন্ডেশন হবিগঞ্জের উপ-পরিচালক মহম্মদ মুনিরুজ্জামান আজান ও নামাজের সময় পূজামণ্ডপে বাদ্যযন্ত্র ও মাইক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রসঙ্গে একটি সার্কুলার দিয়েছেন। বলা হয়েছে, ৯ অক্টোবর জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, 'আজান ও নামাজের সময় পূজামণ্ডপে মাইক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে'। পুরো বাংলাদেশের চিত্র একই! এখন বলা হচ্ছে, এটি অনুরোধ। আগেকার দিনে বাদশা যদি কোনো মেয়েকে দেখে প্রশংসা করে বলতেন, 'আপনার মেয়েটি বেশ সুন্দরী', এর অর্থ হচ্ছে মেয়েটিকে বাদশাকে দিয়ে দিতে হবে অথবা উঠিয়ে নেওয়া হবে। সরকারি অনুরোধ অনেকটা ওইরকম? বলছিলাম হিন্দুদের তো মাত্র বছরে ৫ দিন, সহ্য করুন না যেখানে দেশের মানুষ দিনে ৫ বার করে ৩৬৫ দিন সহ্য করছে?

—**শিতাংশু গুহ,** নিউইয়র্ক।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের অবস্থান

ইজরায়েল নাকি প্যালেস্তাইন? চলতি সংকটে কোনদিকে ঝুঁকে ভারত? গাজায় যুদ্ধ বিরতির সমর্থনে একটি প্রস্তাব পেশ করেছিল জর্ডন। ১২০টি দেশে যুদ্ধ বিরতির পক্ষে ভোট দেয়। বিপক্ষে ভোট পড়ে ১৪টি। ভারত-সহ ৪৫টি দেশ ভোট দানে বিরত ছিল। এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক লিখেছেন, 'মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, চোখের বদলে চোখ হলে গোটা বিশ্ব অন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের দেশ গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের ভোটাভুটিতে অংশ না নেওয়ায় আমি চমকে গিয়েছি'। এর আগে সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদে ইউক্রেনে যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবের ভোটিংও এড়িয়ে গিয়েছিল ভারত।

জোট নিরপেক্ষতা সংকীর্ণ অর্থে হলো পররাষ্ট্র নীতির একটি কৌশল বিশেষ। ব্যাপক অর্থে জোট নিরপেক্ষতা হলো একটি আন্দোলন। অধুনা এই আন্দোলন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় জোট নিরপেক্ষতার মূল লক্ষ্য বিশ্বশান্তির সহায়ক একটি পরিবেশ-পরিমণ্ডল গড়ে তোলা। মার্শাল টিটোর মতানুসারে কোনো জোটের সঙ্গে যোগ না দেওয়াই নিরপেক্ষতা বা নিরপেক্ষতার নীতিবাদ বলে না। জোট নিরপেক্ষতা মানে নিষ্ক্রিয়তা নয়। এ হলো একটি গঠনমূলক, সক্রিয় ও সদর্থক নীতি। এর মাধ্যমেই যৌথ নিরপত্তার ভিত্তি গড়ে তোলা সম্ভব। এর লক্ষ্য যৌথ শান্তি। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রসঙ্ঘের জন্মলগ্ন থেকেই জোট নিরপেক্ষ ভূমিকায় গৌরবময় অবস্থান গ্রহণ করেছে ভারত। ১৯৬৩ সালে জোট নিরপেক্ষ ২৫টি দেশের সভাপতি নির্বাচিত হন ভারতের এন সঞ্জীব রেড্ডী। প্রশ্ন এসে যায়, কংগ্রেসের দেশ ভাগে মুসলিম লিগকে সমর্থনে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, হিন্দু রক্ত প্লাবন, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস দর্শনের মৃত্যু। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গ্রহণ করেছেন 'সনাতনী দর্শন', 'বিশ্বের কল্যাণ হোক' নীতি। তাই ভোট বয়কট জোট নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ। কংগ্রেসের রাজনীতির জন্যই রাজনীতি; দেশ, দেশের মানুষ ও বিশ্বকল্যাণে নয়। পরের যাত্রাভঙ্গে নিজের নাক-কান কাটার রাজনীতি এরা প্রমাণ করছেন না কি?

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
সাহেবের হাট, রাশিডাঙ্গা-২।

প্রথম মহিলা ঘটম্ বাদক
সুকন্যা রামগোপাল

সুতপা বসাক ভড়

দৃঢ় প্রত্যয়, কঠিন পরিশ্রম, অধ্যবসায় নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। আমরা দেখেছি যে, অনেক ক্ষেত্রে পুরুষেরা সুদীর্ঘ সময় ধরে প্রাধান্য বিস্তার করেছেন, বর্তমানে সেখানে মহিলাদেরও অতি স্বচ্ছন্দ বিচরণ। আবার এর বিপরীত দৃষ্টান্তও আমাদের সামনে প্রচুর আছে। সুতরাং বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে লিঙ্গানুসারে কর্মভেদ খুব কম দেখা যায়, অথচ কয়েকদশক আগে পর্যন্ত ব্যাপারটা এত সহজ ছিল না। পড়াশোনা, অফিস-কাছারি, খেলাধুলা, সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, শিল্প, ঘর-সংসার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই একটা অদৃশ্য সীমারেখা ছিল— যে সীমারেখার একপ্রান্তে ছিল মহিলাদের এবং অপর প্রান্তে ছিল পুরুষদের কর্মক্ষেত্র। সমাজেও নানান পরিবর্তন এসেছে, প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে, আবার অনেক সময় তীব্র আগ্রহের জন্য মহিলা পুরুষের কর্মক্ষেত্রের সীমারেখা হালকা হতে শুরু করেছে, যা বেশিরভাগই ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-দেশ ও বিশ্বের কল্যাণে নিবেদিত হয়েছে। সুকন্যা রামগোপাল— এমনই একজন, যিনি ভারতের প্রথম মহিলা ঘটম্ বাদ্যশিল্পী। প্রথম জীবনে তাঁকেও অনেক সংঘর্ষ করতে হয়েছে। কারণ তিনি এমন একটি বাদ্যযন্ত্রে আগ্রহী ছিলেন, যা তৎকালীন সমাজে কেবলমাত্র পুরুষেরাই বাজাবেন— সেটি হলো মাটি দিয়ে তৈরি ঘটম্, যা কর্ণাটক ধ্রুপদী সংগীতের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বাদ্যযন্ত্র। বিয়ের কথাবার্তার সময় পাত্রপক্ষ জানতে চায়, 'তুমি গাইতে পার?' মেয়েটির উত্তর ছিল, 'না, তবে আমি ঘটম্ বাজাতে পারি।' কয়েক দশকে আগে, ওই সময় মাটির তৈরি মোটা ঘটম্ বাজাতেন কেবলমাত্র স্বাস্থ্যবান পুরুষেরা। সেই জায়গায় দীর্ঘাঙ্গী, শাড়ি পরিহিতা একজন মহিলাকে ঘটম্ শিল্পীরূপে মেনে নেওয়া বেশ কঠিন ছিল। তাসত্ত্বেও সুকন্যা মনমাদুরাই ঘটম্ শিল্পী হয়ে ওঠেন।

আজ থেকে ষাট বছর আগে ১৯৬০ সালের শেষের দিকে ভারতের প্রথম মহিলা ঘটম্ শিল্পীরূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ।

যদিও তৎকালীন সময়ে অনেক শিল্পীই সহযোগী শিল্পীরূপে সুকন্যাকে মেনে নিতে পারেননি, তা সত্ত্বেও সুকন্যা উদ্যমের সঙ্গে কোলে ঘটম্ নিয়ে মঞ্চে একের পর এক প্রদর্শন করেছেন। ঘটম্‌কে 'উপপাক্কবাদ্যম্' বলা হয়। এটি মুখ্যত খালিগলায়, বীণা বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গত করে থাকে। কর্ণাটক সংগীতে ঘটম্ একটি মৃদু কিন্তু অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সহবাদ্যযন্ত্ররূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।

তামিলনাড়ুর মাইলাদুথুরাইতে জন্মগ্রহণ করেন সুকন্যা। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে তিনিই সর্বকনিষ্ঠ। দিদি যখন গান গাইত, তখন ছোট্ট সুকন্যা টেবিল-চেয়ার যা পেত, তাই বাজিয়ে দিদিকে সঙ্গত করত। পরবর্তীকালে বিখ্যাত ঘটম্‌শিল্পী ভিক্কু বিনায়করামের ভাই গুরুমূর্তির কাছে বেহালা শিখতে শুরু করেন।

মাত্র বারো বছর বয়সে সুকন্যা বিনয়করামের কাছে ঘটম্ প্রশিক্ষণ নিতে চাইলে, তিনি প্রথমে তাঁকে নিরস্ত করে বলেন যে, এই বাদ্যযন্ত্রটি পুরুষদের বাজানোর যোগ্য, এটি বাজাতে হলে সুকন্যার সুকোমল হাতে 'আঘাত লাগতে পারে, রক্তক্ষরণ হতে পারে। কিন্তু সুকন্যার ছিল দৃঢ়প্রত্যয়। পরবর্তীকালে বিনয়করাম স্থির করেন যে মাত্র এক বছরের মধ্যেই তিনি সুকন্যাকে ঘটম্ পারদর্শিনী করে তুলবেন। মাসের পর মাস কঠোর অধ্যবসায়ের পর সুকন্যা একজন দক্ষ ঘটম্‌শিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

অনেক শিল্পীই যেমন তার সঙ্গে মঞ্চে সঙ্গত করতে চাইতেন না, আবার অনেক সুযোগ তিনি পেয়েছেন, যার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে কর্ণাটক সংগীত জগতে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

১৯৭০ সালে তিনি সর্বভারতীয় বেতারে, পত্রের মাধ্যমে আবেদন করেন যে, অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে ঘটম্‌শিল্পীদের মধ্যে পৃথক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা যেন করা হয়। তাঁর এই আবেদন স্বীকৃত হয়। এরপর সুকন্যা বেঙ্গালুরুতে একটি ঘটম্ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ ছটি ঘটম্ দ্বারা প্রস্তুতি 'ঘটতরঙ্গ' এবং কেবলমাত্র মহিলা শিল্পীদের দ্বারা প্রস্তুত 'স্ত্রী-তালতরঙ্গ।' দূরদূরান্তে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ২০১৪-তে তিনি সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির পুরস্কারের ভূষিত হন।

তাঁরবেঙ্গালুরুর বাড়ির বৈঠকখানার তাকে সারিবদ্ধভাবে ঘটম্ সাজানো আছে। এখানে তিনি তাঁর স্বামী রামগোপালের সঙ্গে বসবাস করেন। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার রামগোপালের বাড়ির মানুষজন বিয়ের সময় শর্ত রাখেন যে, বিয়ের পরে পাত্রীর ঘটম্ বাজানো চলবে না। তখন সুকন্যা বিয়েতে অমত প্রকাশ করেন। কিছুদিন পরে রামগোপাল পুনরায় তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। বর্তমানে তাঁরা সুখী দম্পতি।

সুকন্যা রামগোপালের প্রত্যয়, অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণাবলী তাঁকে এনে দিয়েছে সাফল্য, কৃতিত্ব এবং ভারত পেয়েছে একজন প্রতিভাময়ী ঘটম্ বাদিকা।□

মহিলাদের বিবিধ ক্যানসার ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

স্তন ক্যানসার কাদের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি? যে সকল নারীর ক্যানসারের পারিবারিক ইতিহাস আছে অথবা যাঁদের ভাই ও বোন-সহ নিকট আত্মীয়ের এ রোগ হয়েছে এবং বিশেষভাবে রজো নিবৃত্তির আগে ক্যানসার ধরা পড়েছে, সে সকল নারীর স্তনে ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি বেশি। অবশ্য স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে প্রতি ৫ জনের মধ্যে ৪ জনেরই এ রোগের পারিবারিক ইতিহাস পাওয়া যায়। অস্বাভাবিক মোটা হয়ে যাওয়া, বেশি পরিমাণে চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া, অত্যধিক বিলম্বে সন্তান ধারণ, সন্তানদের স্তন্যদান না করানো ও বন্ধ্যাত্ব স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়।

যে কোনো বয়সে স্তন ক্যান্সার হতে পারে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সম্ভাবনা বাড়তে থাকে।

সুরক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা ঃ সূচনায় রোগ নির্ণয়। স্তন ক্যানসার যত শীঘ্র নির্ণীত হয়, চিকিৎসা তত বেশি সহজ ও প্রলপ্রসূ হয়। যাদের বয়স ২০-৩৫ বছর। প্রতিমাসে একবার নিজে নিজে স্তন পরীক্ষাকরণ। যাদের বয়স ৩৫ বছর এবং তার বেশি। প্রতি বছর চিকিৎসক দিয়ে স্তন পরীক্ষা করুন। প্রতি বছর একবার ম্যামোগ্রাম করুন।

২। **জরায়ু মুখের ক্যানসার :** কাদের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি?

প্রাপ্তবয়স্ক যে কোনো নারী যে কোনও সময়ে জরায়ুমুখের ক্যানসারে আক্রান্ত হতে পারে। খুব কম বয়সে বিয়ে করা এবং বেশি বয়সে সন্তান ধারণ জরায়ুমুখের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়। যে সকল নারীর জননাঙ্গ অপরিস্কার থাকে, জরায়ু মুখে ঘা বা পলিপ, শ্বেতস্রাব, বিভিন্ন প্রকার যৌনরোগ থাকে তাদের এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সুরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা : প্রতিরোধ ও সূচনায় শনাক্তকরণ। জননাঙ্গের

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নারীকে জরায়ু মুখের ক্যানসার থেকে রক্ষা করে। আঠারো বছর বয়সের পরে বিয়ে করা এবং ৩০ বছর বয়সের আগে সন্তান ধারণের মাধ্যমে এই ক্যানসারের সম্ভাবনা অনেকাংশে কমানো যেতে পারে।

জরায়ু মুখে যে কোনো পরিবর্তন 'প্যাপটেস্ট'-এ সূক্ষ্মভাবে ধরা পড়ে। এ পরিবর্তন দেখেই সূচনায় এই ক্যানসার সনাক্ত করা যায়। সূচনা পর্বে যথাযোগ্য চিকিৎসা করালে জরায়ুর ক্যানসার নিরাময় করা সম্ভব।

৩। **ডিম্বাশয়ের ক্যানসার :** কাদের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি?

অন্যান্য ক্যানসারের মতো বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। যে সকল নারীর সন্তানাদি হয়নি, যাঁরা স্বভাববন্ধ্যা অথবা যাদের ৩০ বছর বয়সের পর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে; যে সব মহিলার ৫০ বছর পর মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে, যারা ১০ বছরের বেশি সময় ধরে 'হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি' গ্রহণ করছেন; যাঁদের ডিম্বাশয়, স্তন বা বৃহদন্ত্র ও গর্ভাশয়ের ক্যানসারের পারিবারিক ইতিহাস আছে এবং যাঁদের স্তন ক্যানসার হয়েছে বা হয়েছিল তাদের এ ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা কিছুটা বেশি।

সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা : নিয়মিত পরীক্ষা। বার্ষিক ভিত্তিতে তলপেট পরীক্ষা ও আল্ট্রাসনোগ্রাম করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনও অস্বাভাবিকতার লক্ষণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

৪। **পিত্তথলির ক্যানসার :** কাদের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি?

মূলত মহিলাদের বেশি হয়। পিত্তথলিতে পাথরের প্রদাহই এর মূল কারণ। তেল, চর্বি জাতীয় খাবার, জন্ডিস থেকে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শুরুতে লক্ষণগুলো মৃদু হওয়ায় অপারেশন করতে বিলম্ব হয়। ফলে ক্যানসার অনেক দূর অগ্রসর হয়ে যাওয়ার পর তা ধরা পড়ে।

সুরক্ষার উপায় : চর্বি জাতীয় খাবার বর্জন, নিয়মিত ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম, ওজন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

ক্যানসারের লক্ষণসমূহ : ক্যানসার মানে মৃত্যু নয়। এ রোগের চিকিৎসা আছে। ক্যানসার রোগ ছোঁয়াচেও নয়। প্রাথমিক অবস্থায় বা শুরুতে রোগ নির্ণিত হলে শতভাগ নিরাময় সম্ভব। প্রয়োজন স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সময়মতো চিকিৎসা নেওয়া।

ক্যানসার রোগের লক্ষণসমূহ :

১. খুসখুসে কাশি বা ভাঙা কণ্ঠস্বর, ২. স্তনে বা শরীরে কোথাও চাকা বা পিণ্ড, ৩. গিলতে অসুবিধা বা হজমে গণ্ডগোল, ৪. অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ, ৫. মল-মূত্র ত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন, ৬. সহজে সারছে না এমন কোনো উপসর্গ, ৭. তিন বা আঁচিলের সুস্পষ্ট পরিবর্তন।

উপরোক্ত লক্ষণ মানেই ক্যানসার নয়। দুই সপ্তাহের সাধারণ চিকিৎসায় যদি লক্ষণসমূহ ভালো না হয়— তবে আপনার চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নিন ক্যানসার হয়নি তো? অথবা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। □

হামাস নামক জল্লাদের হামলা

সুবল সরদার

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা আর কতদিন চলবে? রণক্লান্ত পৃথিবী কবে শান্ত হবে? করোনা, যুদ্ধ, প্রকৃতির তাণ্ডবলীলাতে আজ আমরা ভীত, সন্ত্রস্ত। বাঁচার এই শর্তগুলো যদি না থাকতো পৃথিবী কত সুন্দর হতো! পূর্ণিমার আলোতে ফুলের হাসিতে রামধনু রঙা হয়ে উঠতো, খুশিতে ভরে এই পৃথিবী! কবিতার দেশ হয়ে উঠতো। মরু নদীর উপত্যকায় যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। সারা বিশ্বে পড়েছে তার ছায়া। মরু উপত্যকা এখন মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয়েছে। ভীত সন্ত্রস্ত আমরা। প্যালেস্তাইন জঙ্গি বাহিনী হামাস হঠাৎ আক্রমণ হানে ইজরায়েলের উপরে। হামাসকে ফান্ডিং করছে ইরান-সহ ইসলামি দেশগুলো। অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-গুলি দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছে এই যুদ্ধে। ইজরায়েলও তৎক্ষণাৎ জবাব দেয় তাদের অত্যাধুনিক মারণ ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে।

এই যুদ্ধের পটভূমি গাজা ভুখণ্ডের দখল নিয়ে। এই ভূখণ্ডের একদিকে মরুনদী আর অন্যদিকে ভূমধ্যসাগর। ১৯৪৮ সালে ইজরায়েল নামক ওই দেশের জন্ম থেকে আরব দুনিয়া চোখ রাঙাতে শুরু করে। তারা চায় না এতোগুলো ইসলামি দেশের মধ্যে একটা ইহুদি দেশের জন্ম হোক। ইরানের রাষ্ট্রপ্রধান ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লাহ খোমেইনি ইসলামি দুনিয়াকে অনুরোধ করেছিলেন— ‘Boycott anything and everthing that originates with the Jewish of people.’ তাই তারা ঠিক করেছিল ‘নো পিস, নো রিকগনিশন, নো নেগোশিয়েশন, ডেসট্রয় দ্য স্টেট অব ইজরায়েল’। আরব দেশগুলো ১৯৬৭ সালে এই Three Nos-এর উপর ভিত্তি করে এভাবে রেজোলিউশন পাশ করেছিল। তার জবাবে ইজরায়েল বলেছিল ‘if we were to lay down our arms today, there will be no Israel tomorrow.’

মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল নাসের-সহ চার-পাঁচটা আরব দেশ মিলে আক্রমণ শানায়। মিশর-সহ তাদের সহযোগী দেশগুলোর শোচনীয় পরাজয় হয়। সেই যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ছ’দিন। ৬ অক্টোবর ১৯৭৩ সালে আরব দেশগুলো একজোটে আক্রমণ করে ইজরায়েলের উপর, ইহুদিদের ‘ইয়ম কিপ্পুর’ এক পবিত্র দিনে। যুদ্ধ স্থায়ী হয় ১৯ দিন যা ইতিহাসে ‘ইয়ম কিপ্পুর’র যুদ্ধ নামে পরিচিত। ৩৩০০ বছরের এক প্রাচীনতম জাতি ইহুদি। ৩৩০০ বছর পর তারা ফিরে আসে জেরুজালেমে এবং তাঁদের মাতৃভূমির দখল নেয়। From land of Israel to the state of Israel।

এক অভিশপ্ত জাতি ইহুদি। জার্মানির চ্যান্সেলর হিটলারের গ্যাস চেম্বারে কয়েক লক্ষ ইহুদিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। অ্যানে ফ্রাঙ্কের ডায়েরি সেই ভয়ংকর দৃশ্যের এক উল্লেখযোগ্য দিনলিপি বলা যায়। তখন মূলত লড়াই খ্রিস্টান বনাম ইহুদি ছিল। ইহুদিরা যেমন যিশুকে মানে না তেমনি হজরত মহম্মদকে নবি বলে স্বীকার করে না। ইহুদিরা মুসলমানদের মতো শুয়োরের মাংস খায় না।

ইহুদি দেশ গঠনের শুরু থেকেই ইসলামি দেশগুলো বিদ্বেষী ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ধর্মের নামে। তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চায় যতক্ষণ না ওই দেশের পতন হচ্ছে। কতগুলো মতপথের উৎপত্তিস্থল সেখানে— ইহুদি, খ্রিস্টান, ইসলাম, বাবি, সামারিটানিজম, দ্রুজ, বাহাই। এমন পবিত্র দেবভূমি অপবিত্র হয়ে ওঠে করাল যুদ্ধের রণহুংকারে। শান্ত সুন্দর মরুভূমি হাজার হাজার বছর ধরে আবর্তিত হচ্ছে শুধু যুদ্ধের পটভূমিকা তৈরি করে।

এই যুদ্ধে ভারত ইজরায়েলের পাশে থাকার অঙ্গীকার করে। সেখানকার ভারতীয়দের উদ্ধারের জন্যে ‘অপারেশন অজয়’ চালু করেছে। কার্গিল যুদ্ধের সময় ইজরায়েল ভারতকে অত্যাধুনিক রাডার ও স্যাটেলাইট দিয়ে সাহায্য করেছিল। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যিনি প্রথম ইজরায়েল সফর করেছিলেন। গাঁজা (গাজা ভূখণ্ড) ফুঁকছে ইজরায়েল, ধোঁয়া ছাড়ছে প্যালেস্তাইনে, নেশা ধরছে ভারতের সেকুলার-সহ বামপন্থীদের। হামাস, ইসলামিক ব্রাদারহুড, তারা কখনো ব্রাদারহুড অব হিউম্যান বিইং নয়। হামাস একটা আইএসআই-এর মতো আতঙ্কবাদী সংগঠন যারা অনবরত ভারতের শান্তি, শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। ধর্মের নামে জল্লাদের মতো শিশু, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে তাদের হত্যার শিকার হয়। হিটলার যদি জেনোসাইড করে, তারা করে হলোকস্ট। ইসলামের নামে মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করা হামাসের একমাত্র এবং প্রধান লক্ষ্য। ■

ইউরোপের উদ্বাস্তু সমস্যা এবং হামাস-আক্রমণ মুসলমান-বিদ্বেষ বৃদ্ধির অনুঘটক

মৃণাল মজুমদার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর UNO-র Universal Declaration of Human Rights (UDHR), ১৯৪৮-এর আর্টিকেল ১৩ ধারা অনুযায়ী পশ্চিমি দেশে যেসব ব্যক্তি রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছে, তার মধ্যে সংখ্যানুপাতে মুসলমানরা সব চেয়ে বেশি। অর্থাৎ ইসলাম কথিত 'শান্তির ধর্মের' নিয়ম অনুযায়ী যেসব দেশ শাসিত হচ্ছে, সেই সব দেশ থেকেই মুসলমানরা পশ্চিমি দেশে অর্থাৎ খ্রিস্টান অধ্যুষিত দেশে গিয়ে জীবন বাঁচাতে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছে। অর্থাৎ ইসলামিক দেশে মুসলমানদের জীবন বিপন্ন, সেটাই প্রমাণ করে। অমুসলমানদের জীবন যে ইসলামিক দেশে বিপন্ন, সেটাই আমরা এতকাল জানতাম। পশ্চিমিরা এখন বুঝতে পারছে, রাজনৈতিক আশ্রয় যারা নিয়েছে, তাদের অধিকাংশই আইনের অপব্যবহার করেছে। অনেকেই মন্তব্য করে, তাকিয়া নীতি অনুসরণ করে এরা দীর্ঘকাল পশ্চিমিদের বোকা বানিয়ে গেছে, পশ্চিমিদেশে ইসলামের প্রসার করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনামাফিক এই সব অবৈধ মাইগ্রেশন হয়েছে। অন্য মুসলমান দেশ এদের আশ্রয় দেয় না। যদিও প্যালেস্তাইনিদের জর্ডন আশ্রয় দিয়েছে, কিন্তু কখনো নাগরিকত্ব প্রদান করেনি। পশ্চিমিরা মুসলমানদের নির্দিষ্ট সময় বসবাসের পর নাগরিকত্বও দেয়। আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে আগত মুসলমানদের পাকিস্তান কখনো নাগরিকত্ব দেয়নি, উদ্বাস্তু হিসেবেই তাদের বংশপরম্পরায় বাঁচতে হয়। অথচ ভারতের পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, প্রতিবেশী দেশ থেকে কত মুসলমান এসে ভারতীয় সিস্টেমের দুরবস্থার জন্য, ঘুষ দিয়ে ভারতীয় বৈধ নাগরিক হয়ে গেছে। ভারত সরকার আজ পর্যন্ত তার নাগরিকদের নাগরিকত্বের আইডেন্টিটি কার্ড প্রদান করার আইন ও সিস্টেম বানাতে পারেনি। আধার কার্ড এক ধরনের সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড।

যারা যে দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়, তাদের জীবন ধারণের খরচ সেই দেশকেই দিতে হয়। সেই দেশ যদি আর্থিক ভাবে দুর্বল হয়, কখনো কখনো বিশ্বের নানা সংগঠন সাহায্য করে, যেমন বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গা মুসলমানদের খরচ বিশ্বের নানা দেশ ও সংগঠন থেকে আসে। মুসলমানদের জন্মহার তুলনামূলক অনেক বেশি, এদের আশ্রয় দিলে দেশের আর্থিক ক্ষতি হয়, আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়— বাংলাদেশ সেটা রোহিঙ্গাদের নিয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। মুসলমানরা ফেলে আসা দেশের গরিমায় ভোগে, যে দেশে আশ্রয় নেয়, সেই দেশকে আপন করে নিতে পারে না, সেই দেশের ভাষা- সংস্কৃতি-ধর্মকে নিজেদের ফেলে আসা সংস্কৃতির অন্তরায় ভাবে। ব্রিটেন EU ত্যাগ করার মূল কারণ ছিল উদ্বাস্তু সমস্যা।

অথচ যারা জব-ভিসা নিয়ে কোনো দেশে যায়, তাদের দ্বারা সেই দেশের উপকার ছাড়া তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। যেসব তুর্কি নাগরিকরা জব-ভিসা নিয়ে এককালে জার্মানিতে এসেছিল, তারা নিজেরা আইন মানে ও তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করে। তাই ইউরোপ এখন বৈধভাবে জব-ভিসা দিয়ে ইমিগ্রেশন নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।

পশ্চিমি দেশগুলি দীর্ঘদিন ধরেই এই পরিকল্পনামাফিক উদ্বাস্তুর নামে অবৈধ মাইগ্রেশন সমস্যায় জর্জরিত। মানুষ আস্তে আস্তে উদ্বাস্তু সমর্থক

রাজনৈতিক দলগুলো থেকে সমর্থন তুলে নেওয়া শুরু করায়, পশ্চিমি দেশে চরম ডানপন্থী দলগুলোর জনসমর্থন দিন দিন বাড়ছে এবং অনেক দেশে চরম ডানপন্থী দলগুলো ক্ষমতায় আসছে। ২০১৫ সাল থেকে ইউরোপের অনেক দেশেই সিরিয়ান উদ্বাস্তু-ঢলের (আগ্রাসন বলাই ভালো) পর স্থানীয় মানুষের জীবন ধারণের খরচ প্রচুর বেড়ে গেছে। ইউরোপের শহরে অধিকাংশ মানুষ ভাড়া ফ্ল্যাটে বাস করে। সরকার আইন অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে বাধ্য। তাই ঘরের চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে, ঘর ভাড়া অতীতে যেখানে বছরে ২-৩ শতাংশ বাড়তো, সেখানে ২০১৫-র ঘর ভাড়ার তুলনায় বর্তমানে ২০০ থেকে ৩০০ শতাংশ বেড়ে গেছে। উদ্বাস্তুদের মৌলিক চাহিদা পূরণের খরচ সরকার দেয়, কিন্তু স্থানীয় যারা নিজের আয়ে বাস করে, তাদের খরচ নিজেকেই জোগাতে হয়। তাই তারা উদ্বাস্তুদের জন্যই গরিব হয়ে যাচ্ছে।

হামাস ও হামাসকে সাহায্যকারী দেশগুলো ইজরায়েলকে ইহুদিশূন্য করতে গিয়ে, বর্তমানের জেহাদি আক্রমণ ঘটিয়ে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের উপকার করলো না চরম ক্ষতি করলো, তা সময় বলে দেবে।

প্রত্যেক দেশে উদ্বাস্তুরা বিশেষ করে মুসলমান উদ্বাস্তুরা সরকারি নিয়মের আওতা থেকে বাঁচার জন্য সমান্তরাল অর্থনীতি ও সমাজ সৃষ্টি করে। পরিকল্পনামাফিক একই অঞ্চলে থাকে, আস্তে আস্তে স্থানীয় অধিবাসীরা সেই অঞ্চল ত্যাগ করা শুরু করে। পরে সেটা উদ্বাস্তুদের ঘেটো হয়ে যায়। ১০ থেকে ১৫ শতাংশ উদ্বাস্তুও কিন্তু ট্যাক্স দিয়ে কাজ করে না, কিন্তু প্রায় সব উদ্বাস্তু সমান্তরাল অর্থনীতিতে ট্যাক্স বিহীন কাজ করে এবং একই সঙ্গে সরকারি সাহায্য নিয়ে বাঁচে। এদের জন্মহার স্থানীয়দের জন্মহারের প্রায় ৩ গুণ। জনসংখ্যার তুলনায় অপরাধীর সংখ্যা এদের মধ্যে খুব বেশি। প্রত্যেক উদ্বাস্তুর জন্য গড়ে অন্তত জার্মানি সরকারের মাসে প্রায় ১৫০০ ইউরো খরচ হয়। ঘেটো অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। বার্লিনের অধিকাংশ স্কুলের ক্লাসে অ-জার্মান শিক্ষার্থী বেশি, কোথাও কোথাও ৯০ শতাংশ, তাতে করে শিক্ষার মান যেমন খুব কমে গেছে, তেমনি স্কুলে শান্তিশৃঙ্খলা ব্যাহত হচ্ছে।

উদ্বাস্তু চাপ কেমন পর্যায়ে পৌঁছেছে? একটা গ্রামে ২০০ জার্মান নাগরিক বাস করে, সেখানে ৪০০ উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দিতে হয়েছে। ইন্ডোর স্পোর্টস সেন্টার, স্কুল বন্ধ করে উদ্বাস্তু শিবির বানাতে বাধ্য হয়েছে সরকার। মানুষ আর কোনো মতেই মেনে নিতে পারছে না, তাই চরম দক্ষিণপন্থী দলগুলোর প্রতি জনসমর্থন দ্রুত বাড়ছে। ছোটো একটা উদাহরণ দিই, জার্মানির বিদেশি বান্ধব রাজনৈতিক দল এসপিডি, গ্রিন-এর মোট জনসমর্থন যেখানে ২০২১-এর মার্চে প্রায় ৫০ শতাংশ ছিল, আজ সেটা কমে হয়েছে ২৯ শতাংশ, তেমনি এএফডি পার্টির জনসমর্থন ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ২২ শতাংশ। রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়া-জার্মানির রাশিয়া থেকে সমুদ্রের নীচ দিয়ে আসা গ্যাস লাইন পরিকল্পনামাফিক ধ্বংস করার ফলে, সস্তার গ্যাস আসা বন্ধ হয়েছে। এনার্জি খরচ কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়াতে জার্মানির শিল্প উৎপাদন খরচ খুব বেড়ে গেছে। অনেক শিল্প দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে ইউএসএ ও অন্য দেশে। কারণ ইউএসএ সাবসিডি দিচ্ছে,যে সাবসিডি ইইউ আইন মেনে জার্মানির দেওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড ৪.০ কার্যকরী হবার জন্য, অর্থাৎ যে কাজ কম্পিউটার রোবট করতে পারবে, সেটা আর মানুষ করবে না, প্রচুর কর্মসংস্থান বিনষ্ট হয়ে যাবে ২০৩০-এর মধ্যে, সেই সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্ত হবার জন্য এবং এনার্জি খরচ বাড়ার জন্য, হিসেবের বাইরেও অনেক কাজের সুযোগ কমছে। অনুমান করা হয়, যে ২০১০ সালের তুলনায় ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ পদ আর থাকবে না, নতুন কত পদ সৃষ্টি হবে, বলা যায় না। ১০ শতাংশ নতুন পদ হবে কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ যত বেশি বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে, তত বিদেশি বিদ্বেষ বাড়বে।

বেকারত্ব বৃদ্ধির কারণেই হিটলারের এনএসডিএপি পার্টি ক্ষমতায় এসেছিল। ১৯২৮ সালে যেখানে এনএসডিএপি পার্টি ২.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, ১৯৩৩ সালে সেখানে ৪৩.৯ শতাংশ ভোট পেয়ে হিটলার ক্ষমতা দখল করেছিল। তার পরের ইতিহাস সবার জানা। সেই সময় পশ্চিমি দেশের মধ্যে একমাত্র ইতালিতে মুসোলিনির দক্ষিণপন্থী দল National Fascist Party (Partito Nazionale Fascista) ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু আজকের ইউরোপ ও অন্য পশ্চিমি দেশগুলোতে চরম দক্ষিণপন্থী দলগুলো ক্ষমতায় আসছে বা আসার পথে। আর এর জন্য অর্থনীতি দায়ী নয়, দায়ী হলো ইসলামি উদ্বাস্তু সমস্যা। কাজেই বিদেশি বিদ্বেষ কোন পর্যায়ে যেতে পারে, কল্পনা করা যেতে পারে। আর এই উদ্বাস্তু সমস্যা যে ধর্মযুদ্ধের আকার নেবে না, সেটা কী করে নিশ্চিত হওয়া যাবে? অধিকাংশ দেশ তার অবৈধ এমিগ্র্যান্টদের ফেরত নিতে চায় না। আর্থিক সাহায্য দিলেও, বৈধভাবে কাজ নিয়ে এমিগ্র্যান্ট ফেরতের চুক্তি করতে চাইলেও এরা কোনো দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে রাজি নয়। ভূমধ্যসাগরের আফ্রিকান দেশগুলো ছাড়াও তুরস্ক ঢালাও ভাবে ইউরোপে অবৈধ ভাবে উদ্বাস্তু প্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে। ইউরোপ যদিও তুরস্ককে প্রতিবছর প্রচুর অর্থ দেয়, সিরিয়ান শরণার্থীদের ভরণ পোষণ করার জন্য, কিন্তু তুরস্ক টাকা নিয়েও, ইউরোপের দিকের সব অবৈধ অনুপ্রবেশকারী আটকায় না। যেহেতু বৈধ পরিচয়পত্র ছাড়া আশ্রয় নেওয়ার আইন আছে, তাই অনেক সময় দেখা যায়, এক দেশের উদ্বাস্তু অন্য দেশের নামে আশ্রয় নেয়। আর ফেরত পাঠানো সম্ভব হয় না।

হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধের জন্য পশ্চিমি দেশগুলোতে বর্তমানে বসবাসকারী মুসলমানদের অনেকে বেআইনিভাবে গাজার পক্ষে মিছিল করেছে। সেই মিছিলকারীদের দ্বারা অনেক পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্সের ডাক্তার কর্মীরা আহত হয়েছেন, তেমনি ইহুদি বিরোধী স্লোগান ও ইহুদিদের বাড়িঘর, ধর্মস্থান আক্রমণ হচ্ছে। ইমিগ্র্যান্টদের এই আচরণে স্থানীয় মানুষ খুব ভীত ও ক্ষুব্ধ। বর্তমানে যেসব নির্বাচন হচ্ছে, তাতে জনগণের ভয়ের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। নতুন সরকার ক্ষমতায় এলে আইন পালটাবেই, যা ইমিগ্র্যান্টদের বিরুদ্ধে যাবে। তখন এদের ফেরত পাঠাতে গেলে যে সমস্যা হবে, সেই সমস্যা যে জেহাদের আকার নেবে না, নিশ্চিত হয়ে বলা যায় না। হামাস ও হামাসকে সাহায্যকারী দেশগুলো ইজরায়েলকে ইহুদিশূন্য করতে গিয়ে, বর্তমানের জেহাদি আক্রমণ ঘটিয়ে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের উপকার করলো না চরম ক্ষতি করলো, তা সময় বলে দেবে। ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

হামাসের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের কঠোর প্রত্যাঘাত সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার লড়াই

এমন শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন যাতে পৃথিবীর কোথাও সন্ত্রাসবাদীরা এরকম বর্বর ঘটনা ঘটাতে না পারে।

সাধন কুমার পাল

ইজরায়েলের বর্তমান আয়তন ২২ হাজার বর্গকিলোমিটার। ইজরায়েলের জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি। দিল্লি শহরের জনসংখ্যার চাইতেও কম। এর মধ্যে ইহুদি ৭৩.৮ শতাংশ, ১৮ শতাংশ মুসলমান , ১.৯ শতাংশ খ্রিস্টান। প্যালেস্তাইনের মোট জনসংখ্যা ৫০ লক্ষ। এর মধ্যে ৯৯ শতাংশ মুসলমান এবং ১ শতাংশ খ্রিস্টান। প্যালেস্তাইন দুটি ভূখণ্ডে বিভক্ত। একটি হচ্ছে ৪১ কিলোমিটার লম্বা ও ১২ কিলোমিটার চওড়া। গাজা ভূখণ্ড। অন্যটি ওয়েস্ট ব্যাংক। এই দুটি ভূখণ্ডে কোনো ইহুদির বসবাস নেই। বলা ভালো ইহুদিদের পক্ষে বসবাস করা সম্ভব নয়। ঠিক যে কারণে বাংলাদেশে, পাকিস্তানে হিন্দুদের বসবাস করা কঠিন, ঠিক একই কারণে প্যালেস্তাইনে ইহুদিদের বসবাস অসম্ভব।

যারা ইজরায়েলকে কট্টরপন্থী এবং প্যালেস্তাইনকে উদারপন্থী বলছে তাদের এই দাবির পক্ষে কোনোরকম যুক্তি তত্ত্ব পরিসংখ্যান নেই। তথ্য পরিসংখ্যান যা বলছে তা হলো প্যালেস্তাইন হচ্ছে একটি কট্টরপন্থী ইসলামিক ভূখণ্ড যেখানে অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাসের কোনো অধিকার নেই। অন্যদিকে ইজরায়েল হচ্ছে ভারতের মতোই একটি সভ্য উদারপন্থী মানুষের ভূখণ্ড যেখানে এই উত্তেজনার পরিস্থিতিতেও মুসলমানরা নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারে।

ইজরায়েলের বসতিগুলো লক্ষ্য করে আকস্মিক ও অতর্কিত হামলা চালিয়েছে প্যালেস্তাইনের হামাস জঙ্গিরা। গত ৭ অক্টোবর সকাল থেকে চালানো এই হামলায় নিহত ইজরায়েলিদের সংখ্যা ৭০০ ছাড়িয়েছে। এছাড়া হামাসের ভয়াবহ এই হামলায় আহত হয়েছে আরও প্রায় ১৬০০ ইজরায়েলি। ৮ অক্টোবর এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইজরায়েল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইজরায়েলে হামাসের বিশাল মাল্টি-ফ্রন্ট হামলায় নিহতের সংখ্যা ৭০০ ছাড়িয়েছে বলে চিকিৎসা কর্মকর্তাদের সূত্র দিয়ে হিব্রু ভাষার মিডিয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। টাইমস অব ইজরায়েল বলছে, সকাল থেকে চালানো এই হামলায় কমপক্ষে ১ হাজার ৫৯০ জন ইজরায়েলি আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর।

এছাড়া কয়েক ডজন অসামরিক নাগরিক এবং ইজরায়েলি সামরিক বাহিনীর (আইডিএফ) সৈন্যদের আটক করে গাজায় নিয়ে গেছে হামাস। অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার ক্ষমতাসীন এই গোষ্ঠীটি গর্ব করে বলেছে, আটক ইজরায়েলিদের সংখ্যা ইজরায়েল যা জানে তার চেয়েও অনেক বেশি।

গাজা উপত্যকা কী?

গাজা উপত্যকা ইজরায়েল, মিশর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে একটি ৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ১২ কিলোমিটার প্রশস্ত অঞ্চল। যেখানে প্রায় ২৩ লক্ষ লোক বসবাস করে এবং এটি বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা।

হামাস কেন ইজরায়েলের উপর হামলা চালিয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যেকটি ভারতবাসীর জানা প্রয়োজন। স্থানীয় কারণ যাই হোক না কেন, এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন হামাস ইহুদিদের প্রাচীন মাতৃভূমি ইজরায়েল থেকে ইহুদিদের বিতাড়ন করে ওই স্থানে ইসলামিক শাসন কায়েম করতে চায়।

এই ধরনের বর্বর হামলা ভারতবর্ষে বহুবার হয়েছে। এক সময় ভারতবর্ষকে হিন্দু শূন্য করার লক্ষ্য নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে তৈমুর লঙ, চেঙ্গিজ খাঁন, বক্তিয়ার খলজি, মহম্মদ ঘোরি, সুলতান মাহমুদ, আওরঙ্গজেব, বাবরের মতো ইসলামিক আক্রমণকারীরা। আফগানিস্তান, পাকিস্তানকে হিন্দুশূন্য করার জন্য এই ধরনের বর্বর হত্যালীলা চালানো হয়েছে। এই ধরনের বর্বর হত্যালীলা সংগঠিত হয়েছে কাশ্মীরে, বাংলাদেশে। হামাসের মতো একই কায়দায় পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী কাসভ মুম্বইয়ে হত্যালীলা চালিয়েছিল, কাশ্মীরের পুলওয়ামায় পাকিস্তানি জঙ্গিরা সেনা জওয়ানদের নির্মমভাবে হত্যা

করেছিল। ভারতে যে রকম কত হামলা হয়েছে সেটা গুণে শেষ করা যাবে না।

এই সমস্ত ঘটনা ভুলে গেলে চলবে না। ভুলে গেলে ইজরায়েলের মতো ভারতকেও মাশুল গুণতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইজরায়েলে ৫০ বছর পরে এত বড়ো হত্যালীলার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। ইতিহাস বলছে ভারতেও এই ধরনের ঘটনা যে কোনো সময় ঘটতে পারে।

ইহুদিদের একটি পবিত্র দিনে উৎসবের মাঝে হামাস জঙ্গিরা হামলা চালিয়েছিল কেন? এর উত্তর জানতে হলেও পণ্ডিত হওয়া দরকার নেই। ১৯৪৬ সালের কোজাগরি লক্ষ্মী পূজার দিন নোয়াখালীতে ইসলামিক জেহাদিরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মা লক্ষ্মীর আরাধনায় রত নিরপরাধ হিন্দুদের ওপর। সেদিন কেউ রেহাই পায়নি। আবাল-বৃদ্ধ- বণিতা সবাইকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছিল।

প্রতি বছর অক্টোবরে 'সিমচাট তোরাহ' পালন করে ইজরায়েল। ইহুদিদের পবিত্র উৎসবগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। ৭ অক্টোবর শনিবার ছিল সেইদিন। ফলে গাজা স্ট্রিপ সংলগ্ন এলাকায় মিউজিক ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে জড়ো হয় প্রচুর ইহুদি ও বিদেশি পর্যটক। তখনই 'অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড' শুরু করে হামাস জঙ্গিরা।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, জেনে শুনেই এই দিনটিকে বেছেছিল জঙ্গিরা। উৎসবের আবহে কিছুটা হালকা মেজাজে ছিল ইজরায়েলি সেনা। ফলে ইহুদি ভূমিতে জল-স্থল ও আকাশপথে অনুপ্রবেশ ঘটাতে সুবিধা হয় জঙ্গিদের। মিউজিক ফেস্টিভ্যালে ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে অন্তত ২৫০ জনকে হত্যা করে তারা। সেখান থেকে মহিলা ও শিশুদের পণবন্দি করার খবরও মিলেছে।

'ইয়ম কিপ্পুর'-এর যুদ্ধ :

দ্বিতীয় কারণ হিসেবে 'ইয়ম কিপ্পুর'-এর কথা বলেছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। ১৯৭৩-র ৬ অক্টোবর ছিল ইহুদিদের পবিত্রতম দিন ইয়ম কিপ্পুর। কিন্তু ওই দিনই আরব দেশগুলির জোট হামলা চালায় ইজরায়েলের ওপর। দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় ভয়ংকর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। যাতে প্রাণ গিয়েছিল অন্তত ২০ হাজার মানুষের। মাত্র দু' সপ্তাহের ওই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জিতে যায় ইজরায়েল। শুধু তাই নয়, গোলান হাইটস্, সিনাই-সহ আরব দেশগুলির একাধিক জায়গা দখল করে নেয় ইজরায়েলি সেনা। যুদ্ধ চলাকালীন ইজরায়েলকে সমর্থন করলে পশ্চিমি দেশগুলিকে তেল সরবরাহ বন্ধ করার হুমকি দিয়েছিল পশ্চিম এশিয়ার আরব দুনিয়া। তারপরও ইহুদিদের প্রত্যাঘাত সহ্য করতে পারেনি তাঁরা। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সেই পরাজয়ের ক্ষতে এবার প্রলেপ লাগাতে চাইছে হামাস। সেই কারণেই গাজা স্ট্রিপ এলাকা থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে পাঁচ হাজার রকেট হামলা চালিয়েছে হামাস।

একটি প্রচলিত কথা আছে। কথাটি হলো ইজরায়েল হওয়া সহজ নয়। ইজরায়েলে এক কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ৭৪ লক্ষ ইহুদি। এই ৭৪ লক্ষ ইহুদির চারদিকে ২২টি ইসলামিক দেশ অর্থাৎ শত্রুদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই ২২টি দেশে ৪৫ কোটিরও বেশি মুসলমানের বসবাস। ইজরায়েল ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত একটি ছোট্ট দেশ এবং চারদিক থেকে শত্রু দেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইজরায়েলকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করতেই দেশের মধ্যে যারা সমালোচনা করছেন, তাদের অবগতির জন্য জানাই যে ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কারগিল যুদ্ধের সময় ইজরায়েল এমন কিছু অস্ত্র ও প্রযুক্তি দিয়ে ভারতকে সাহায্য করেছিল যা না হলে সে সময় ভারতের পক্ষে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জেতা অসম্ভব হয়ে উঠতো। ভারতের ইজরায়েলের সঙ্গে যেমন ভালো সম্পর্ক তেমনি প্যালেস্তাইন-সহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলির সঙ্গেও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্যালেস্তাইনের ওপর আক্রমণকে নয়, সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হামাসের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের আক্রমণকে সমর্থন করেছেন। কোনো অজুহাতেই সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন নয়।

কংগ্রেস প্যালেস্তাইনকে সমর্থন জানিয়ে দলীয়ভাবে বক্তব্য সম্প্রচার করেছে, কিন্তু সেখানে হামাসের সন্ত্রাসবাদী হামলার কোনো নিন্দাসূচক বাক্য উচ্চারিত হলো না কেন এই প্রশ্ন কিন্তু ভারতবাসী তুলবে। চীনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বামপন্থীরা তো হামাসকেও সন্ত্রাসবাদী বলছে না। গণশক্তি হেডিং করেছে 'ইজরায়েলের ভেতরে হামাস যোদ্ধারা'। গণশক্তি পড়লে মনে হবে এরা যেন হামাসের মুখপত্র। এখানেই শেষ নয় ভারতের মধ্যেও হামাসের পক্ষে মিছিল-মিটিং হচ্ছে। এদিকে ইজরায়েলে হামাসের হামলার পর থেকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুসছে ভুক্তভোগী ভারতের আমজনতা। ফলে এই ধরনের সন্ত্রাসবাদের সমর্থনে প্রদর্শন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া হামাসকে এমন শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন যাতে পৃথিবীর আর কোনো জায়গায় সন্ত্রাসবাদীরা এরকম বর্বর আক্রমণের ঘটনা ঘটাতে না পারে। ▮

ফঃ ৪

জঙ্গি হামাসের বিরুদ্ধে ভারতের বুদ্ধিজীবীরা শীতঘুমে

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

হামাস, এই একটা শব্দের খোঁজ যে মাধ্যমেই করি, একটাই উত্তর আসবে— এটি একটি জঙ্গি সংগঠন। এটি পাকিস্তানের আইএসআই, ইরাক-ইরানের ইসলামিক স্টেট বা নাইজেরিয়ার বোকোহারামের মতো বা তার থেকেও ভয়ানক অমানবিক আততায়ী জঙ্গি সংগঠন। যারা বুক ফুলিয়ে প্যালেস্তাইনে লালিত পালিত। যাদের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রথম থেকেই ইহুদিদের হোমল্যান্ড ইজরায়েলে শান্তি স্বস্তি বিঘ্নিত করা। যারা আজকেও ইহুদিদের দেশ হিসেবে ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দেয় না। বার বার সন্ত্রাস চালায়। এ কোনো স্বাধীনতার লড়াই নয়। এও এক প্রকার ইসলামিক জেহাদি আগ্রাসন। প্যালেস্তাইনও বিতর্কিত প্রতিবেশী ইহুদি দেশ ইজরায়েলকে কোনোদিনই সাদরে গ্রহণ করেনি। যুদ্ধ, অশান্তি, সন্ত্রাসে ইজরায়েলের পশ্চিম ভূখণ্ড বার বার বিধ্বস্ত হয়েছে। প্যালেস্তাইনের প্রথম রাষ্ট্রপতি ইয়াসির আরাফত ঘোর ইজরায়েল বিদ্বেষী ছিলেন। সেই ইজরায়েল বিদ্বেষের রসদ আসতো তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে। তারপর ঠাণ্ডা যুদ্ধ, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন। রসদ কমতে থাকলে হাওয়া বুঝে অনেক দরাদরি, শেষে ইয়াসির ১৯৯৩-তে অসলো শান্তি চুক্তি করলেন। ইজরায়েলের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের চুক্তি। প্যালেস্তাইনের শান্তির চুক্তি পাকিস্তানেরই মতো। তাহলে হামাস এল কোথা থেকে? ইয়াসির আরাফতের তৈরি প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা পিএলও, যা ১৯৭৪ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। হঠাৎ প্যালেস্তাইনেরই মানুষ বলতে থাকল ওর চাইতেও মজবুত (জঙ্গি ধর্মে) সংগঠন তৈরির দরকার।

তাই ১৯৮৭-তে জন্ম নিল হামাস। যাদের প্রথম এবং শেষ লক্ষ্য বাকি সব ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনের মতোই সমগ্র বিশ্বকে ইসলামিক দেশে পরিণত করা। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে হামাস বার বার তার জঙ্গি কার্যকলাপ জারি রেখেছে ইজরায়েলকে ইহুদি মুক্ত করার লক্ষ্যে। ইজরায়েল সামরিক ভাবে অত্যন্ত বলীয়ান এবং একটি নিউক্লিয়ার শক্তিমান দেশ। কিন্তু হামাস তাদের জেহাদ মেশিনারিতে ভরসা করে ইজরায়েল সম্পূর্ণটাই প্যালেস্তাইনে পরিণত করতে মরিয়া। আরও আছে, পিআইজে। প্যালেস্তাইনের এও দ্বিতীয় জঙ্গি সংগঠন। ১৯৭৯ সালে এরা এক সময় মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের একটি শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সশস্ত্র এই জঙ্গি সংগঠন মূলত ইরানের বিপ্লব থেকে উদ্দীপ্ত এবং ইরান ছাড়াও সিরিয়া ও লেবাননের জঙ্গি সংগঠন হেজবুল্লাহর থেকেও বিপুল সমর্থন পেয়েছে। ১৯৯৭ সালে তাদের এই সংগঠনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকাভুক্ত করে এবং এর সেক্রেটারি জেনারেলকে ২০১৪-তে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অনেকে মনে করেন হামাস ছেলেমানুষ! প্যালেস্তাইনের সবচেয়ে শক্তিমান উগ্রবাদী সংগঠন আসলে পিআইজে যার নিজস্ব সামরিক শাখা আছে যার নাম আল-কুদস-ব্রিগেড। নব্বইয়ের দশকে এরাই ইজরায়েলের দিকে বার বার রকেট নিক্ষেপ করেছিল। আরও গল্প আছে, হামাস এবং পিআইজে দুই জঙ্গি সংগঠনই ১৯৯৩-এর অসলো শান্তি চুক্তির বিরোধী। হামাস এবং পিআইজে একই মুদ্রার দু'দিক। আত্মঘাতী হামলা, বিস্ফোরণ, রকেট নিক্ষেপ আর যা যা ভাবে জেহাদের নামে ইজরায়েলবাসীকে বিধ্বস্ত করা যায় সব তারা করে। প্যালেস্তাইন চুপটি করে এই জঙ্গিদের হাত ধরে বসে। প্যালেস্তাইন আর পাকিস্তানের লক্ষ্য একই— আগ্রাসন। ইসলামিক শক্তির অধিকার বিস্তার। কিন্তু আমাদের দেশের ক'জন বুদ্ধিজীবী বিশেষ করে যারা লেফট লিবারাল বা যারা আলট্রাসেকুলারিজমের ধ্বজাধারী রাজনীতিক, যারা এ দেশে শাহিনবাগ আন্দোলন-প্রেমী, ততজনই প্যালেস্তাইন

ভক্ত।

এই আলোচনা আবার মাথাচাড়া দিল, কারণ গত ৭ অক্টোবর, শনিবার, হামাস ইজরায়েলে অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড চালায়। তাতে হাজার হাজার ইজরায়েলির প্রাণ যায়। হামাস পণবন্দি করে শয়ে শয়ে ইজরায়েলিকে। প্যালেস্তাইনের এই অতর্কিত জঙ্গি হামলার পর ইজরায়েলের প্রত্যাঘাত খুব স্বাভাবিক এবং সঙ্গতও। প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার অধিকার প্রতিটি সুস্থ দেশের আছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে গাজার কোনো অঞ্চলই নিরাপদ নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত। ইজরায়েলের প্রতি আক্রমণে অনেক প্যালেস্তাইনির প্রাণ যাচ্ছে। যুদ্ধ চলছে, যে যুদ্ধ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকেও হয়তো পিছনে ফেলবে। যুদ্ধের সমর্থন, নিরীহ মানুষের আর্তনাদ, যে দেশেই হোক শিশুদের গৃহহারা স্বজন হারানোর শোক যন্ত্রণা কোনো সুবিবেচক মানুষ সমর্থন করে না। আমরাও করি না। যদি কোনো দৈববলে প্রতিটা ব্যারেলকে রুদ্ধ করা যেত তবে বোধহয় দেশ হিসেবে ভারত সবচেয়ে স্বস্তি পেত। কিন্তু আমাদের দেশের এক বড়ো অংশের বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়াতে মনে হচ্ছে জঙ্গি হামাসরা দুগ্ধপোষ্য শিশু আর ইজরায়েলের মতো ভিলেন দ্বিতীয় কেউ নেই। তারা বলছে না হামাস কতটা অমানবিক, নৃশংস, জঘন্য। যারা অতর্কিত ভাবে ইজরায়েলের বেসামরিক নাগরিকদের, শিশুদের, মহিলাদের ওপর আক্রমণ করে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ওই জঘন্য ঘটনার ২১ দিন পর টেলিভিশন ভাষণে বললেন, 'আমরা যুদ্ধ করব, আমরা স্থলে বা আকাশে কোথাও সৈন্য প্রত্যাহার করব না।' কিন্তু আমাদের দেশের লেফট লিবারালরা এমন ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করছে যেন মনে হচ্ছে ইজরায়েল একটা জঙ্গি দেশ। তারা ইজরায়েলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে, আংশিক সত্য বিকৃত ভঙ্গিতে উপস্থাপন এই বিশেষ মগজের বুদ্ধিজীবীরাই করতে পারে।

যাদের বিপ্লবের রসদ আসে চীন কিংবা নানান ইসলামিক সংগঠন থেকে। যারা ২০২১-এও প্যালেস্তাইনের আতর্কিত রকেট হামলার পর শীতঘুমে ছিল। কিন্তু যেই ইজরায়েলের পালটা আঘাত হানার পালা এল, অমনি নড়ে উঠল তাদের বিবেক এবং ইসলাম প্রেম। তার সঙ্গে অবশ্যই ইজরায়েল নিন্দা। সেদিনও ভারতের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ইজরায়েলের প্রতিরোধকে সমর্থন জানিয়েছিল, আজকেও জানাচ্ছে। আমাদের এই বিশেষ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের অতি প্রতিক্রিয়া শুরু ২০১৭-র পর থেকে যখন নরেন্দ্র মোদী ইজরায়েল যান, যা ভারতের ইতিহাসে প্রথম ঘটনা। ইজরায়েলকে বন্ধু সম্বোধন করলেন মোদী। আমাদের দেশের লেফট লিবারালরা সেই ন্যারেটিভে চলেন যে ন্যারেটিভে 'আল জাজিরা' প্রতিবেদন পেশ করে। আমাদের দেশে সর্ষের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে, যে সব বুদ্ধিজীবীর দেশহিতে ভাবা উচিত তারা হামাসের জঙ্গি নেতাকে বীর বলে। ২৭ অক্টোবর কেরালার মালাপ্পুরমে হামাসের পূর্বতন প্রধান খালিদ মাশাল ভার্চুয়ালি যোগদান করল 'Palestine Solidarity event'-এ! জামাত-ই-ইসলামি হিন্দ নামক আর এক নিষিদ্ধ সংগঠনের যুব শাখার তরফ থেকে কেরালার মাটিতেই খালিদ মাশালকে 'স্বাধীনতা সংগ্রামী'দের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

তারপরেও আমাদের দেশের একটিও লেফট লিবারাল বুদ্ধিজীবীর প্রতিবাদ দেখা যায়নি। কেরালা রাজ্য সরকারের কোনও প্রতিক্রিয়াই নেই। অরুন্ধতী রায়ের মতো বিশেষ বুদ্ধিজীবীরা দৌড়ে আসেন প্যালেস্তাইনের পক্ষে অর্থাৎ জঙ্গি হামাসের জন্য সমর্থন দিতে। আসলে জটিলতা অনেক গভীরে। প্যালেস্তাইনের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফত যার কথা আগেও উল্লেখ করেছি, তাকে একটা সময় আমাদের দেশের বাম-কংগ্রেস সমর্থন দিয়েছে। তাকে হিরোর আসন দিয়েছে।

হামাসরাও কী এদেশের ভোটব্যাংক ?

আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা অ-চীনাপন্থী সবাইকেই শ্রেণী শত্রু মনে করেন। কমিউনিস্টরা ভার্নন গঞ্জালভেস, সুধা ভরদ্বাজ, অরুণ পেরেরা থেকে ভারভারা রাওয়ের মতো ব্যক্তিদের বুদ্ধিজীবী বলে। যারা সত্য স্থাপন এবং সন্ত্রাস সংগঠনের পার্থক্যটুকু বোঝে না তারা তো হামাসের নীরব সমর্থক হবেই। বামপন্থীরা মনে করে ইসলাম সাম্যবাদী। এবং পৃথিবীতে যত সন্ত্রাস হচ্ছে তার জন্য ধর্মীয় কট্টরবাদ দায়ী নয়। দায়ী সাম্রাজ্যবাদ। তারা হিন্দু শব্দে নাক সিঁটকায়। কিন্তু একটাও জেহাদ বিরোধী ভাষণ কেউ পাবে না। ভারতের বামপন্থী এবং তাদের ক্যাম্পের বুদ্ধিজীবীরা জেহাদিদের কাছে মাথা বন্ধক রেখেছে। তাদের শিরায় উপশিরায় বইছে ইসলাম তোষণের অভ্যাস। ফলে উগ্রবাদী যদি ইসলামপন্থী হয় তার বিরুদ্ধে শব্দ করা বারণ। হামাসরা তো এ দেশের ভোটব্যাংক নয়। প্রতিবাদ করলে কার ভোট কমতো? কিন্তু ইসলাম ভক্তি কতটা গভীরে যার পরিণামে হামাসের বিরুদ্ধে শব্দে নৈব নৈব চ আর যত নিন্দা ইহুদি দেশ ইজরায়েলকে ঘিরে। এদের নীরবতা আবার প্রমাণ করল, ভারতের জন্য কত বড়ো অপশক্তি কমিউনিস্ট মাইন্ড সেট।

সোভিয়েতের স্তালিন এবং চীনের মাও যা যা সমর্থন করেছে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরাও তাই-ই করেছে। আজব কথা এই যে, খোদ প্যালেস্তাইনের বুদ্ধিজীবী সারি নাসিবেহ জঙ্গিগামী প্যালেস্তাইনের রূপ থেকে আশাহত আশ্চর্য হয়ে লিখে ফেললেন, 'What is a Palestinian State Worth ?' কিন্তু আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা হামাসের জঙ্গি কার্যকলাপের পরেও কবি মাহমুদ দারভিশের কবিতাতে আশ্রয় নেয়— 'আমিই সেই প্যালেস্তানিয়ান, আমিই গর্বে দাঁড়িয়ে আছি-– ডেভিডের শিশু। হাতে আমার শুধু একটা পাথর, এই নিয়েই আমার সংগ্রাম। ইজরায়েলি গোলিয়াথের বিরুদ্ধে একা লড়ব, এতটুকু ভয় নেই আমার'। ইহুদি দেশকে ফ্যাসিবাদ বলা হয় কিন্তু হামাসকে অবৈধ বলা বারণ।

অক্টোবরে হামাসের জঙ্গি আক্রমণের পরেও এআইএমআইএম (মিম)-এর সভাপতি আসাদউদ্দিন ওয়াইসি থেকে শুরু করে সিপিআইএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি কিংবা ক্যারাভানের রাজনৈতিক সম্পাদক হরতোশ সিংহ বাল, সাংবাদিক সাইমুল্লাহ খান এবং এমন অনেকেই তাদের প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট করলেন যে তারা সদা চিন্তিত প্যালেস্তাইনের জন্য। অর্থাৎ পরোক্ষ ভাবে হামাসের জন্য সমর্থন বা সন্ত্রাসের বিষয়ে অন্তত‍পক্ষে মুখ বন্ধ। আমাদের দেশের বড়ো অংশের বুদ্ধিমত্তা (স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবী) এতটাই ইসলাম তোষণে ব্যস্ত যে, যখন ২০২১-এর ১৫ মে, হামাসের বর্বর রকেট হামলায় হামাসে কর্মরত কেরালার সেবিকা সৌম্যা সন্তোষের মৃত্যু হয়, তখন কোনো প্রতিবাদ ওঠে না। কোনো নিন্দা আসেনি এ দেশের লিবারাল বুদ্ধিজীবীদের থেকে। শুধু কি তাই! কেরালার মুখ্যমন্ত্রী হামাসের নিন্দা করার কিছু সময় পরেই তড়িঘড়ি সেই ট্যুইট মুছে দিলেন। কোথাও কেউ হামাসের সমালোচনা করতেই জোর পেলেন না। ইসলাম তোষণের এই ইন্ধন আজকেও বুদ্ধিজীবীরা স্বৈরাচারী কমিউনিস্ট চীনের থেকেই পাচ্ছে। সদ্য Taipei Times-এ প্রকাশিত অ্যান্টনিও গ্রাসিফোর 'China's connection to Israel attacks' শীর্ষক প্রতিবেদনে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, চীন মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক সখ্য রক্ষা করছে। ইরানের মুখ্য বাণিজ্য দোসর চীন। চীন ইরানকে সামরিক যন্ত্র সরঞ্জাম সরবারহ করে। ইরান তা আবার দেয় হামাসকে। ইরান চীনের আনুকুল্যে হামাসের দিকে বছরে ৭০-১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অস্ত্র সরঞ্জাম দিচ্ছে। তাই চীন যে পথে হাঁটে, একথা অলিখিত সত্য আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরাও সেই পথেরই পথিক হন।

কারণ তাদের মগজের 'চেয়ারম্যান' চীনের 'চেয়ারম্যান'। চীনের প্রতিক্রিয়া আরও একটা উদাহরণেই স্পষ্ট হবে। যে মুহূর্তে সামরিক প্রত্যাঘাত করল ইজরায়েল, তার অনতিবিলম্বেই চীনা সংস্থা আলিবাবা-সহ আরও অনেকেই তাদের ডিজিটাল সিস্টেম থেকে ইজরায়েলের নামটাই সরিয়ে দেয়! শি জিংপিং সমব্যথী প্যালেস্তাইনের জন্য। বিশ্বের যে কোনো সংঘর্ষ, যুদ্ধ, হামলায় সাধারণ মানুষের জন্য সবসময়ই আমরা সমব্যথী। কিন্তু সেই সমস্যার মূলে যে জঘন্য পাশবিক ইসলামিক জঙ্গি হামাস রয়েছে এবং যা প্যালেস্তাইনের মুখ্য শক্তি তার বিরুদ্ধে সরব না হওয়া মনে ইসলামিক জিহাদকে প্রশ্রয় দেওয়া। গোঁড়া ইসলামিক আগ্রাসনকে মাথা পেতে মেনে নেওয়া। আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা তা সে স্বরা ভাস্বর হোক কিংবা বৃন্দা কারাত সবার কথা ও সুর পাকিস্তানের পিস কমিটির সভাপতি আহমেদ হাসানের সঙ্গে মিলে যায়। সবাই এক ঝাঁকের কই। তাই সবাই ইহুদি দেশ ইজরায়েলের দিকে আঙুল তোলে। কেরালার কমিউনিস্ট নেতা এ কে বালান কেরল মুসলিম লিগের হাত ধরেছেন। কোঝিকোড়ে ১১ নভেম্বর তারা প্যালেস্তাইনের জন্য শোক জ্ঞাপন করেন। একবার কংগ্রেস নেতা ভুল (মুখ ফসকে) করে বলে ফেললেন হামাস জঙ্গিবাদী। কমিউনিস্ট পার্টি-মুসলিম লিগের হাত ধরাধরি করে তীব্র কটাক্ষ করতে দেরি হলো না এই মন্তব্যের। হামাসের অতর্কিত জঙ্গি হানা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ রীতির পরিপন্থী। সারা বিশ্ব তাকে নিন্দা করছে। সারা বিশ্ব একদিকে এবং কমিউনিস্ট মাইন্ড অন্যদিকে।

জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী

গোপাল চক্রবর্তী

দুর্গার রূপভেদ জগদ্ধাত্রী। মায়াতন্ত্রে (দ্বিতীয় ও চতুর্থ পটল) ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে দুর্গা প্রসঙ্গে দেবী জগদ্ধাত্রীর কথা উত্থাপিত হয়েছে। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রী পূজার বিশেষ বিধান পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর বৃহস্পতি রায়মুকুটের 'স্মৃতি রত্নহার' ও শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণির 'কৃত্যতত্ত্বার্ণব' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

মহিষাসুর বধের সময় দেবীকে বিভ্রান্ত করার জন্য মহিষাসুর বারবার রূপ পালটাতে থাকে। এক সময় সে প্রচণ্ড মত্ত হস্তীর রূপ ধারণ করে দেবীকে আক্রমণ করে। দেবী দুর্গা তখন চতুর্ভুজা সিংহ বাহিনী মূর্তি ধারণ করে চক্রদ্বারা সেই করীন্দ্রাসুরের মস্তক ছেদন করলে মহিষাসুর পুনরায় মহিষ রূপ ধরণ করে। হস্তী বা করী রূপ মহিষাসুর নিগ্রহের সেই চতুর্ভুজা চতুর্প্রহরণধারিণী (বাম হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও ধনুক, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে চক্র ও পঞ্চবাণ)। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকৃত তন্ত্রসারে জগদ্ধাত্রীর যে ধ্যান পাওয়া যায় তাতেও এই রূপের বর্ণনা রয়েছে। দেবী রক্তবস্ত্র পরিহিতা এবং নানা অলংকারে ভূষিতা, বালার্কের ন্যায় তাঁর গাত্রবর্ণ। সর্প তাঁর যজ্ঞোপবীত।

পুরাণ মতে সমবেত দেবতার মিলিত তেজপুঞ্জে সৃষ্টি হলেন দেবী দুর্গা। দেবতাদের প্রদত্ত অস্ত্রসমূহের দ্বারা তিনি বধ করলেন দুরাত্মা মহিষাসুরকে। দেবতারা বিপদ মুক্ত হয়ে ভাবলেন, এই দেবী আমাদের শক্তিতেই শক্তিমতী। তাঁর নিজস্ব কোনো অস্তিত্বই নেই। দেবতাদের মধ্যে অগ্রণী, ইন্দ্র, অগ্নি, পবন আর বরুণ। তাঁরা নিজেদের সর্বশক্তিমান ভাবতে শুরু করলেন। দেবী দুর্গা তখন তাদের অহংকার ভঙ্গের জন্য এক বালিকার রূপ ধরে তাঁদের কাছে এলেন এবং একটি তৃণখণ্ড তাঁদের সামনে রাখলেন। ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলেন তৃণের উপর, বজ্র ব্যর্থ হলো। অগ্নি সেই তৃণখণ্ডকে দহন করতে পারলেন না। বায়ু প্রচণ্ড প্রবাহে তাকে একচুলও নড়াতে অপারগ হলেন। প্রচণ্ড বারিপ্রবাহে বরুণ সেই ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডকে ভেজাতে পারলেন না। দেবগণ তখন নতমস্তক হলেন। আর সেই বালিকা রক্তাম্বরা, সালংকারা, চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে দেবতাদের বুঝিয়ে দিলেন যে তিনিই সর্বশক্তির আধার, জগতের ধারণকর্ত্রী, জগদ্ধাত্রী।

উপনিষদে ইনি উমা হৈমবতী। রাজসিক দেবী দুর্গা, তামসিক দেবী কালীর পর সত্ত্বগুণ সম্পন্ন দেবী জগদ্ধাত্রী। তবে কালীপূজা বা দুর্গাপূজার মতো জগদ্ধাত্রী পূজার বহুল প্রচলন বঙ্গদেশে নেই। কথিত আছে, কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সর্বপ্রথম জগদ্ধাত্রী পূজা প্রচলন করেন। বাঙ্গলার নবাব তখন আলিবর্দি খাঁ, ১৭৫১ সাল। বারবার মারাঠা হানায় বিপর্যস্ত নবাব, রাজকোষ শূন্য। নবাব কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে দাবি করলেন ১২ লক্ষ টাকা নজরানা। কৃষ্ণচন্দ্র দিতে পারলেন না সেই অর্থ। তখন কৃষ্ণচন্দ্রকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া

হয় মুর্শিদাবাদে। রানি তখন কৃষ্ণচন্দ্রকে মুক্ত করার জন্য তাঁর সমস্ত অলংকার জগৎশেঠের কাছে বন্ধক রেখে নবাব দরবারে ১২ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দেন। কাঙ্ক্ষিত অর্থ প্রাপ্তির পর নবাব কৃষ্ণচন্দ্রকে মুক্তির আদেশ দেন। মুক্ত হয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বজরায় ফিরছেন কৃষ্ণনগরে। শরৎ ঋতু, আশ্বিন মাস, দুর্গাপূজার সময়। এ বছরে বন্দিদশার জন্য পূজার আয়োজন হয়নি, রাজার মন তাই ভারাক্রান্ত। দৈবক্রমে সেইদিন ছিল বিজয়াদশমী। মায়ের বিসর্জন চলছে গঙ্গার তীরে তীরে। আকুল হয়ে উঠল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মন। কান্নায় ভেঙে পড়লেন রাজা। সেই রাতে মা চতুর্ভুজা রূপে তাঁকে দর্শন দিয়ে আদেশ করলেন, আগামী শুক্লা নবমীতে একদিনে তিনবার মায়ের পূজা করলে তিনি দুর্গাপূজার ফল প্রাপ্ত হবেন। প্রাসাদে ফিরে কৃষ্ণচন্দ্র পূজার আয়োজন করলেন। কার্তিকের শুক্লা নবমীতে মহাসমারোহে হলো মায়ের পূজা। সেই থেকে শুরু জগদ্ধাত্রী পূজার।

জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন সম্পর্কে আর একটি মত হলো কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে এই পূজার প্রচলন করেন কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র গিরীশচন্দ্র। এখানে জগদ্ধাত্রী পূজা পুরানো প্রথা মেনে শুধুমাত্র নবমী তিথিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রজারা চাষা পাড়ায় জগদ্ধাত্রী পূজার আয়োজন করেন যা 'বুড়িমার পূজা' নামে সুপরিচিত। ১৭৯০ সালে গোবিন্দ ঘোষ ঘট ও পটের পরিবর্তে প্রতিমায় এই পূজার সূচনা করেন। বর্তমানে কৃষ্ণনগরে বারোয়ারি পূজার সংখ্যা প্রায় দু'শতাধিক।

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেছিলেন চন্দননগরের ফরাসি সরকারের দেওয়ান এবং কৃষ্ণচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। তিনি কৃষ্ণনগরের অনুকরণে লক্ষ্মীগঞ্জের চাউল পট্টিতে প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেন। এই লক্ষ্মীগঞ্জেই পরবর্তীকালে আরও তিনটি বড়ো পূজার সূচনা হয়। বর্তমানে চন্দননগরে ছোটো বড়ো তিন শতাধিক পূজা হয়। প্রতিমা, মণ্ডপসজ্জা এবং অসাধারণ আলোকমালায় সজ্জিত জগদ্ধাত্রী পূজা সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা দুর্গা পূজার মতো সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী তিনদিনে সম্পন্ন হয়। দশমীতে বিসর্জনের শোভাযাত্রা বিশেষ আকর্ষণীয়।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জয়রামবাটি গ্রামে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিণী মা সারদামণির জন্মভিটায় জগদ্ধাত্রী পূজা বিশেষ রূপে প্রসিদ্ধ। এই পূজার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু অলৌকিক কাহিনি ও কিংবদন্তী।

রামকৃষ্ণ মিশনে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন মা সারদার নির্দেশেই হয়েছিল। বেলুড়মঠে এই পূজার প্রচলন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং। বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্র রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে শাস্ত্র বিধি মেনে, নিষ্ঠার সঙ্গে জগদ্ধাত্রীপূজা সম্পন্ন হয়।

দুর্গা বা কালী পূজার তুলনায় বঙ্গদেশে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে ঘটে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর রাজধানী নদীয়ায় জগদ্ধাত্রী পূজা প্রচলনের পরে ক্রমশ এই পূজার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এর কারণ অবশ্যই আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি। এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় হেমন্ত ঋতুতে। এই সময়ে গ্রাম বাঙ্গলার ঘরে ঘরে নতুন ধানের সমারোহ, মাঠে মাঠে শাকসবজি, গ্রীষ্ম-বর্ষার দুর্ভোগের অবসানে মানুষের হাতে অর্থ, মনে আনন্দ। আর এই সময়ে আনন্দময়ী জগদ্ধাত্রীর আগমনে মানুষ তো মেতে উঠবেই।

দুর্গা হৈমবতী জগদ্ধাত্রী, আনন্দময়ী কল্যাণদায়িনী, কিন্তু যুগে যুগে অসুর শক্তিকে পর্যুদস্ত করার জন্য হয়ে ওঠেন ধ্বংসাত্মিকা। পূজার পুণ্যলগ্নে মায়ের কাছে প্রার্থনা— অশুভ আসুরিক শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য তিনি জাগ্রত হন। শরণাগতদের রক্ষা করেন। করুণা ধারায় ভক্তজনকে স্নাত করেন। 'ওঁ দ্দং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ। ▯

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

ছটপূজায় জলাশয়ে সূর্য উপাসনা আচার কেন্দ্রিকতা ভিন্ন আর কী কারণ?

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী এবং অরিত্র ঘোষ দস্তিদার

এক সময় সূর্য উপাসনাই ছিল; ইদানীং 'আলোয় ফেরার অনুষ্ঠান'। কৃষি ও প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ সান্নিধ্যের পালপার্বণ। জলাশয়ে দাঁড়িয়ে সৌর উপাসনার মধ্যে আলো আর জলের সাহচর্যে উন্মুক্ত বায়ুমণ্ডলে সালোকসংশ্লেষের ভাবনা আছে। আর যে ভাবনা উজিয়ে দেয় তা হলো সৌর উপাসকদের আর মন্দিরগুলি কোথায় গেল?

যারা হিন্দুদের মূর্তি ভাঙায় অভ্যস্ত, যারা মূর্তিপূজার বিরোধী, পুতুলপূজাকে অস্বীকার করে, তারা কি ছটপূজায় সায় দেবে? যতদূর জানি ছট পূজায় মূর্তি নেই, নির্বিকল্প প্রকৃতি উপাসনার ঐতিহ্য আছে। সংস্কৃত 'ষষ্ঠী' কথা থেকে 'ছট্' কথাটি এসেছে; যার অর্থ ছয়। কার্তিক শুক্লা ষষ্ঠী তিথির এক উপাসনা; সূর্যের উপাসনা; সূর্যের সহধর্মিণী ঊষা বা 'ছটি মা'-এর আরাধনা।

ভারতের কয়েকটি রাজ্য যেমন বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও নেপালের মাধেশ অঞ্চলে ছটপূজার প্রাধান্য ও ঔজ্জ্বল্য। এখানকার মানুষ কর্মসূত্রে নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, ছটপূজার আয়োজনও গেল ছড়িয়ে। ছড়ালো ভারত ও বিশ্বের নানান জায়গায়। জানা যায়, মূর্তি উপাসনা না হওয়ার কারণে কোথাও কোথাও মুসলমানদেরও ছট্ উৎসব পালন করতে দেখা যায়। এখন এই ছড়িয়ে পড়া মনটিকে কুড়িয়ে নেওয়ার পালা।

পরিবেশবিদরা বলে থাকেন এই পূজা পরিবেশ-বান্ধব। প্লাস্টিকের ব্যবহার এই পূজায় নেই, ক্ষতিকারক রঙের ব্যবহার নেই, জলে প্রতিমা বিসর্জনের ব্যাপারও নেই। তাই পরিবেশ প্রকৃতিকে দূষণের সম্ভাবনাও নেই।

সূর্য আমাদের সমস্ত শক্তির উৎস। প্রভাতে ও সায়াহ্নে সূর্য বন্দনার মধ্যে রয়েছে আলট্রাভায়োলেট রশ্মিমুক্ত সূর্যালোককে দেহমন্দিরের মধ্যে সমন্বয়করণের প্রয়াস। ছটপূজায় সকাল-সন্ধ্যেতে পুষ্করিণীর ধারে ধর্মীয় কৃত্যের মধ্যে প্রতীয়মান হয় আলো ও জল; সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সবুজ উদ্ভিদের মধ্যে আলো, জল ও পরিবেশের বায়বীয় উপাদানের সামীপ্যে তৈরি হওয়া খাবারই জীবকুলের বেঁচে থাকার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। তাই সূর্যদেবকে সস্ত্রীক ধন্যবাদ জ্ঞাপনই এই পূজার মূল বিবেচ্য। আমরা প্রকৃতিকে নিয়েই বাঁচবো, সূর্যসম্ভব দেবতা আমাদের নিরন্তর আশীর্বাদ করুন, এই বিশ্বাসে, এই ভরসায়।

ছটপূজার ডালিতে কী থাকে? থাকে কৃষিপণ্য, যা প্রকৃতির আশীর্বাদ, যা দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গিত নৈবেদ্য যেন। সধবা নারী বাঁশের কুলোয় সূর্যের পানে সাজিয়ে ধরেন এক টুকরো খোসাসমেত আখ, পরিচ্ছন্ন করে রাখা মূলাগাছ, গোটা নারকেল, বাতাবি লেবুর গোটা ফল, পাকা কলার একটি ছড়া এবং আলাদাভাবে পুষ্টকলার কাঁদি, ঠেকুয়া মিষ্টি, কিছু ফুল ইত্যাদি। কমলা রঙে রঙিন সিঁদুরের পবিত্র চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয় ডালার মধ্যস্থ ফলের গায়ে। যেন তোমারই প্রদত্ত ফসলের আশীর্বাদ তোমাকেই উৎসর্গ করলাম শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়, কৃতজ্ঞতায়। যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সম্পন্ন হলো। ছটপূজা প্রকৃত অর্থেই একটি কৃষি-কেন্দ্রিক প্রকৃতি পূজা। ▯

কার্তিক মাসের মাহাত্ম্য

কানু রঞ্জন দেবনাথ

কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'রূপসী বাংলা' কাব্য গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় লিখেছেন— 'আবার আসিব ফিরে, ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাঙ্গলায়/হয়তো মানুষ নয় হয়তো-বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;/হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে/ কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়'।

কার্তিক হচ্ছে দুই ঋতুর মোহনা; শরৎ আর শীতের মোহনা। এই মাসের তাপমাত্রা থাকে খুবই আরামদায়ক। হঠাৎ বৃষ্টিতে ভেজা নেই, সারাদিন গুমোট মেঘলা আকাশ নেই, গ্রীষ্মের গরম নেই, আবার শীতের কনকনে ঠাণ্ডাও নেই। কার্তিক মাস বা হেমন্তে দেখা যায় দিগন্তব্যাপী নীল আকাশ। মিষ্টি সোনা রৌদ্র। কার্তিকের শিশির ভেজা ঘাসের ডগা যেন মুক্তোর মেলা। ত্রিপুরা রাজ্যে কার্তিকের শেষের দিকে গ্রামের মাঠে মাঠে ধান কাটার ধুম পড়ে।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে কার্তিক মাসের অনেক মাহাত্ম্য আছে। কার্তিক মাস অত্যন্ত শুভ মাস। এই মাসটিকে জপ, তপ, ব্রত, সাধনা মাস বলে মনে করা হয়ে থাকে। কার্তিকমাসে শ্রীভগবানকে ভক্তি-সহ এবং পূজার্চনা করলে ভগবান ভক্তের সমস্ত ইচ্ছা বা মনস্কামনা বা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। পুরাণ অনুযায়ী, বিষ্ণু এই মাসে নারায়ণরূপে জলে বাস করেন। এই কারণে কার্তিক কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথি থেকে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন সূর্যোদয়ের আগে নদী বা পুকুরে স্নান করে অক্ষয় পুণ্য লাভ করা যায়। শাস্ত্র অনুযায়ী যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে প্রতিদিন গীতা পাঠ করেন তাঁর অনন্ত পুণ্য অর্জন হয়। এই মাসে গীতার একটি অধ্যায় কোনো ব্যক্তি পাঠ করলেও ওই ব্যক্তি ঘোর নরক থেকে মুক্তি লাভ করেন। স্কন্দ পুরাণ অনুযায়ী এই মাসে অন্নদান করলে পাপ নাশ হয়। কার্তিক মাসকে ত্যাগের মাসও বলা হয়।

কার্তিক মাসের ধর্মীয় মাহাত্ম্য :
পুরাণ অনুযায়ী কার্তিক মাসে মহাশক্তিশালী তারকাসুর বধ করেছিলেন কুমার কার্তিক। তাই কুমার কার্তিকের পরাক্রমকে এবং বীরত্বকে সম্মান জানানোর জন্য এই মাসকে তাঁর নামে রাখা হয় কার্তিক মাস।

মৎস্যরূপে সমুদ্র থেকে বেদ উদ্ধার : একটি পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে শঙ্খাসুর নামে এক অসুর ব্রহ্মার কাছ থেকে বেদ চুরি করে পালাচ্ছিল। সেই সময় শঙ্খাসুরের হাত থেকে বেদ সমুদ্রের জলে পড়ে যায়। বেদ জলে পড়ে যাওয়ার ভবিষ্যৎ পরিণাম চিন্তা করে দেবতারা সকলে মিলে ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে এর বিহিত প্রার্থনা করেন। দেবতাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু তখন মৎস্যরূপ ধারণ করে সমুদ্রের জল থেকে বেদকে উদ্ধার করেন। তখন তিনি বলেন যে, কার্তিক মাসে সমস্ত বেদের সঙ্গে তিনি স্বয়ং জলে বাস করবেন। তাইতো এই মাসে নিয়মিত স্নান ও পূজা করলে কুবেরের আশীর্বাদ লাভ করা যায়। আবার যারা এই মাসে বিষ্ণুর পূজা করবে, তাঁরা যম লোক কিংবা স্বর্গ লোকের পরিবর্তে বৈকুণ্ঠধাম লাভ করবেন। 'বৈকুণ্ঠধাম' মানে সেই ধাম বা স্থান যেখানে গেলে জন্ম মৃত্যুর এই চক্র থেকে চিরতরে মুক্তি পেয়ে ভগবানের শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়ে চিরসুখী থাকা যায়। হিন্দুধর্মে বৈকুণ্ঠ বা বিষ্ণুলোক হলো ভগবান বিষ্ণু এবং দেবী লক্ষ্মীর আবাস। এটি হলো ঈশ্বরের বাড়ি বা আবাস। বৈকুণ্ঠে রয়েছে স্বর্ণের প্রাসাদ, দিব্য ও চিন্ময় বিমান এবং অতি সুন্দর ও মনোরম উদ্যান বা বাগান। বৈকুণ্ঠের উদ্যানে সুগন্ধযুক্ত মিষ্টি ফল ও ফুল উৎপন্ন হয়।

কার্তিক মাসে ব্রত পালন করে বৈকুণ্ঠ লাভের কাহিনি :
পৌরাণিককালে এক গণিকা ছিলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ও তার পরবর্তীকালের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচার করতে শুরু করেন তিনি। একদা এক ঋষির কাছে গিয়ে মুক্তির উপায় জিজ্ঞেস করেন। ঋষি তাঁকে কার্তিক স্নানের মাহাত্ম্য জানান। এরপর গণিকা প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নান করে তীরে প্রদীপ জ্বালিয়ে বিষ্ণু ও সূর্যের

উপাসনা শুরু করেন। এই পুণ্য অর্জন করার ফলে গণিকার কোনোরকম কষ্ট ছাড়া তাঁর দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যায়। এরপর দিব্য বিমানে বসে বৈকুণ্ঠের দিকে চলে যান গণিকা।

রুক্মিণীর কাহিনি : পদ্মপুরাণ অনুযায়ী পূর্বজন্মে রুক্মিণী গঙ্গাতীরে বসবাসকারী একজন বিধবা ব্রাহ্মণী ছিলেন। গঙ্গাস্নান করার পর রোজ তুলসী পূজা ও বিষ্ণুর ধ্যান করতেন। কার্তিক মাসের শীতের সময়ে গঙ্গায় স্নান করে পূজা করার সময়ে তাঁর শরীর থেকে প্রাণ নির্গত হয়। সেই ব্রাহ্মণীর আত্মা এত পুণ্যার্জন করে যে তিনি লক্ষ্মীর সমান স্থান লাভ করেন। এই পুণ্যের ফলে তিনি কৃষ্ণের সহধর্মিণী হন।

কৃষ্ণ ও সত্যভামার কাহিনি : কৃষ্ণ তাঁর ভার্যা সত্যভামার কাছে কার্তিক মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, সত্যভামা পূর্বজন্মে বিষ্ণুর পূজা করতেন। কার্তিক মাসে সূর্যোদয়ের আগে স্নান করে তুলসী গাছের সামনে প্রদীপ প্রজ্বলিত করতেন। সেই পুণ্যের ফলে সত্যভামা পরবর্তী জন্মে কৃষ্ণের স্ত্রী হন।

বিষ্ণুর প্রিয় মাস কার্তিক : সমস্ত মাসের মধ্যে কার্তিক মাস বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় মাস। এই মাসকে তাই দামোদর মাস বলা হয়ে থাকে। শাস্ত্রে এই মাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিছু নিয়ম আছে। সেগুলি নিম্নরূপ :

(১) কার্তিক মাসে সূর্যোদয়ের আগে স্নান করলে সমস্ত পাপ ধুয়ে যায় এবং মোক্ষ বা বৈকুণ্ঠ বা জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি' লাভের পথ প্রশস্ত হয়।

(২) এই মাসে তুলসী পূজার খুব মাহাত্ম্য আছে। তাই এই মাসে প্রতিদিন তুলসীর পূজা করে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানো উচিত।

(৩) এই মাসে অন্ন, উলের পোশাক, তিল, দীপদান, আমলকী দান করা অত্যন্ত শুভ। এই কাজ করলে লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পাওয়া যায়।

(৪) প্রতিদিন গীতা পাঠ, মন্দির, নদী, তীর্থস্থানে প্রদীপ প্রজ্বলন করলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়।

কার্তিক মাসে নীচের কাজগুলি না করলেই ভালো। যেমন—

(১) যেহেতু মনে করা হয় যে কার্তিক মাসে বিষ্ণু জলে বাস করেন, তাই অনেকেই এই মাসে মাছ খান না।

(২) যেহেতু এই মাস হলো নিয়ম মাস, তাই এই মাসে শরীর, মনে সংযম রেখে চললে খুবই ভালো।

(৩) কার্তিক মাসে দিবানিদ্রা দিতে নেই।

(৪) এই মাসে শরীরে তেল লাগানো নিষিদ্ধ। শুধু নরক চতুর্দশীর দিনে শরীরে তেল লাগাতে হয়। নরক চতুর্দশী দীপাবলীর একদিন আগে পালিত হয়। কথিত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কার্তিক মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশীতে নরকাসুরকে বধ করেন, তাই এই দিনটিকে নরক চতুর্দশী বলা হয়ে থাকে। নরক চতুর্দশীকে 'নরক নিবারণ চতুর্দশী' 'ভূত চতুর্দশী' বা 'ছোটো দিওয়ালি' বলা হয়। অকালমৃত্যু থেকে মুক্তি এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য এই পূজা করা হয়।

কার্তিক মাস দামোদর মাস : কার্তিক মাস শ্রীহরির সেবার মাস। কার্তিক মাস বা দামোদর মাস ভক্তগণের কাছে অতীব মাহাত্ম্যপূর্ণ। কেননা এই মাসে হরিভক্তির অনুকূল যে কোনো কাজই সহস্রগুণ বেশি ফল প্রদান করে। ভক্তিভরে ভগবদ্ সেবা করলেও ভগবান শ্রীহরি অতিশয় প্রীত হন। কার্তিক মাসের অন্যতম একটি ভগবৎ সেবা হচ্ছে ভগবানের মন্দিরে বা গৃহ মন্দিরে ভগবানের উদ্দেশে দীপদান। বিভিন্ন শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে এই মাসে শ্রীহরি মন্দিরে দীপদান করলে আর জন্ম মৃত্যুময় এই জগতে ফিরে আসতে হয় না।

এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনি আছে। কোনো এক মূষিকা কার্তিক বা দামোদর মাসে একাদশীর দিনে ঘটনাক্রমে অন্যের জ্বালানো প্রদীপের তেল খেতে গিয়ে তার মুখের সাহায্যে প্রদীপের সলতে জাগিয়ে দেয়। ফলে প্রায় নিভে যাওয়া প্রদীপের আলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং এই পুণ্যের ফলে মূষিকার বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। শাস্ত্রে আরও বলা আছে, যদি কেহ প্রদীপ দেখাতে নাও পারে, শুধুমাত্র প্রদীপ প্রজ্বলিত বিষ্ণুমন্দির দর্শন করেন তবে সেই বংশের কেউ নরকগামী হন না।

কার্তিক বা দামোদর মাসের গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন— 'এই পবিত্র মাসে যারা ভগবান শ্রীদামোদরের উদ্দেশে ভক্তিসহকারে ভগবানের আনন্দ বিধানের জন্য প্রদীপ নিবেদন করেন তাঁদের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত হয়ে হৃদয়ে জ্ঞান প্রদীপ প্রজ্বলিত হয় এবং সমস্ত কলুষতা থেকে মুক্ত হয়। অবশেষে মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তি লাভ করে গোলোক গতি বা বৈকুণ্ঠ লাভ হয়।'

কার্তিক মাস নিয়ম সেবার কাল ও অক্ষয় পূর্ণ অর্জনের মাস : এই মাসে নিরামিষ ভোজন আহারের বিধান আছে। স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে— অব্রতেন ক্ষিপেদযন্ত মাসং দামোদর-প্রিয়ম। তির্যগমোনীমবাপ্নোতি সর্বধর্ম বহিষ্কৃতঃ।। স ব্রহ্মহ স গোঘ্নশ্চ স্বর্ণস্তেয়ী সদানুতী। ন করোতি মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ! যো নঃ কার্তিকে ব্রতম্'।। অর্থাৎ 'হে মুনি শ্রেষ্ঠ নারদ। ভগবান শ্রীদামোদরের প্রিয় কার্তিক মাস যে ব্যক্তি বিনা নিয়মে অতিবাহিত করে সে ব্যক্তি সর্বধর্ম বহিষ্কৃত ও তির্যকযোনী প্রাপ্ত হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি কার্তিক ব্রত করে না সে ব্রহ্মঘাতী, গো ঘাতী, স্বর্ণ অপহারী ও সদা মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে।'

দামোদর মাস কেন? যে সময়টাতে মা যশোদা দেবী তাঁর পুত্র গোপালকে প্রেমরজ্জু বন্ধনে বেঁধেছিলেন তা ছিল কার্তিক মাস। বৈষ্ণব ভক্তদের নিকট তা 'দামোদর মাস'। দামোদর = দাম + উদর। দাম কথার অর্থ দড়ি বা বন্ধন রজ্জু। আর উদর কথার অর্থ কোমর বা পেট। বাৎসল্য রসের বশে আজও ভক্তপ্রাণ হিন্দু বাঙ্গালি প্রভুর অমৃতময় লীলা কথা শ্রবণে সারা বছর তৎপর থাকেন।

বিশেষত এই মাসটিতে শুধু বঙ্গ নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এমনকী বহির্ভারতের বিভিন্ন দেশেও ভগবানের লীলা কথা শ্রবণে ভাগবতাদি বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ ও কীর্তনে সাড়া পড়ে যায়। □

ফঃ ৫

ত্রিপুরা বিদ্যাভারতীর রাজ্য স্তরের বিজ্ঞান মেলা

গত ১৯ অক্টোবর বিদ্যাভারতী পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের ত্রিপুরা রাজ্যস্তরের বিজ্ঞান মেলা সম্পন্ন হয় আগরতলার গান্ধীধামস্থিত ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দিরে। বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য ফরেস্ট অ্যাকাডেমির নির্দেশক শ্রীমতী পৌশলী রায়। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইআইটি-র অধ্যাপক ড. সঞ্জয় মিত্র, আইসিএফএআই বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপিকা ড. স্বর্ণালী নাথ, চৌধুরী ফরেনসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. অর্পণ দত্ত রায়, গান্ধীধাম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রঞ্জিত দাস ও সঞ্জীব দেবনাথ এবং মহিলা পলিটেকনিকের অধ্যাপক ড. অপূর্ব সহ। বিজ্ঞানমেলায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের খুদে বিজ্ঞানীরা তাদের নির্মিত মডেল-সহ অংশগ্রহণ করে।

বিজ্ঞান মেলায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যাভারতীর প্রান্তীয় বিজ্ঞান প্রমুখ অপর্ণা দেবনাথ। মুখ্য অতিথি তাঁর বক্তব্যে বিদ্যাভারতীর এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি এই বিজ্ঞানমেলায় উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেন এবং সকল বিদ্যার্থীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

বিজ্ঞান সপ্তাহের সর্বোত্তম আয়োজকের শংসাপত্র লাভ করে ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দির, গান্ধীধাম। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের আচার্যা পৌলমী মজুমদার এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিদ্যাভারতীর সভাপতি ধীরেন্দ্র কলই।

বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের আলোচনা সভা

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের মহিলা মহাবিদ্যালয়ে আইকিউএসি এবং সংস্কৃত বিভাগের উদ্যোগে গত ৩ সেপ্টেম্বর 'আয়ুর্বেদ শাস্ত্র' বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় ছাত্রীদের মঙ্গলাচরণ এবং মঞ্চাসীন অতিথিদের হাতে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আলোচনা সভার শুভারম্ভ হয়। মুখ্য অতিথি ও বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. চন্দন ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক ড. মৃণাল চন্দ্র দাস। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন কলেজের আইকিউএসি কো-অর্ডিনেটর ড. কিরণ সুনার-সহ বিবিধ বিষয়ের অধ্যাপক মণ্ডলী।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. মধুসূদন চৌধুরী। প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা বিদ্যায় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের গৌরবগাথা বিস্তারিত তুলে ধরেন এবং এর বর্তমান প্রেক্ষাপট বিষয়ে আলোকপাত করেন অধ্যাপক চন্দন ভট্টাচার্য। সভা সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক ড. পানু পোদ্দার এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক রাহুল মহন্ত।

সমাজ সেবা ভারতীর উদ্যোগে নবদুর্গাপূজার আয়োজন

সমাজ সেবা ভারতী, পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে মহানবমীর পুণ্যতিথিতে নবদুর্গা পূজার আয়োজন করা হয় সংস্থার কুঁদঘাট কার্যালয়ে। ৭টি সেবাবস্তি থেকে পিছিয়ে পড়া সমাজের ২২ জন কুমারী কন্যাকে নবদুর্গা রূপে পূজা করা হয়। বিধি মেনে এই পূজার আয়োজন এক ভিন্ন মাত্রার পরিবেশ সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল, প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী। শ্রী পাল তাঁর বক্তব্যে বলেন, সমাজে নারীদের ওপর যখনই আক্রমণ নেমে এসেছে তখনই মা আদ্যাশক্তি অসুরবিনাশিনী রূপ ধরে অসুর বধ করেছেন। বর্তমান সময়েও নারীদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন অব্যাহত। এই অন্যায়কে সমাজ থেকে বিদূরিত করার প্রয়োজনে আমাদের সবাইকে সমাজ সচেতনতার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। সমাজ সেবা ভারতীর এই নবদুর্গা পূজার আয়োজনের মাধ্যমে নারীজাতিকে পূজা করে তাঁদের সম্মান প্রদানের মাধ্যমে সমাজ জাগরণের প্রয়াস অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। পূজা শেষে ওই ২২জন কন্যাকে নতুন বস্ত্র প্রদান করা হয়।

মালদহে বিবেকানন্দ সেবা প্রকল্পের উদ্যোগে নরনারায়ণ সেবা

মালদহ বাচামারী গভঃ কলোনিস্থিত বিবেকানন্দ শিশু মন্দির পরিবারের ব্যবস্থাপনায় এবং বিবেকানন্দ সেবা প্রকল্পের উদ্যোগে গত দুর্গাসপ্তমী থেকে বিজয়াদশমী পর্যন্ত এক নরনারায়ণ সেবা এবং বস্ত্র উপহার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চারদিনে ১৭৮৯ জন নরনারায়ণ অংশগ্রহণ করেন এবং ১১৬ জনকে বস্ত্র উপহার হিসেবে দেওয়া হয়।

বিজয়াদশমীর দিন শিশু মন্দিরের সম্পাদক প্রীতমরঞ্জন রায় এবং বিবেকানন্দ সেবা প্রকল্পের সভাপতি প্রিয়ব্রত মালাকার উপস্থিত সবাইকে বিজয়ার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ইডেনে বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলার টিকিট কেলেঙ্কারি

নিলয় সামন্ত

ইডেনে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপের ম্যাচের টিকিটের জন্য হাহাকার ছিল শহরজুড়ে। এরই মধ্যে রমরমিয়ে কালোবাজারিদের দৌরাত্ম্য চলেছে। বেশকিছু মানুষকে টিকিট কালোবাজারির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আর তাদের থেকে উদ্ধার করা হয় প্রচুর টিকিটও। রিপোর্ট অনুযায়ী, ৯৬টি টিকিট উদ্ধার করেছিল পুলিশ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই টিকিটগুলিকে চড়া দামে বিক্রি করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। বিরাট কোহলির জন্মদিনের আবহে টিকিটগুলিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, সেদিনের ম্যাচে এই ৯৬টি টিকিটের জন্য বরাদ্দ আসনগুলি ফাঁকাই থাকবে। কিন্তু কার্যত সেই শূন্য আসনগুলি খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ পরে জানিয়েছিল, ধৃতদের কাছ থেকে ১২৭টি টিকিট উদ্ধার করা হলেও সেগুলি কোথা থেকে এসেছে, তা নিয়ে ধন্দে ছিল পুলিশ।

টিকিট পাননি সিএবি-র আজীবন সদস্যেরাও। টিকিট না পেয়ে সিএবি-র বিরুদ্ধে ময়দান থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন এক আজীবন সদস্য। প্রসঙ্গত, টিকিট নিয়ে এমন কালোবাজারি চললেও সিএবি-র শীর্ষকর্তারা তদন্তের ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে কত দূর সহযোগিতা করছেন, তা নিয়েও অনেকের মনে প্রশ্ন আছে। পুলিশের খবর, কালোবাজারিরা কীভাবে টিকিট জোগাড় করছে তা জানতে সিএবি-র সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বা তাঁর প্রতিনিধিকে ময়দান থানায় হাজির হওয়ার জন্য নোটিস দিয়েছিল লালবাজার। সেদিন তাঁরা কেউ আসেননি। সিএবি দাবি করে, তাঁরা ব্যস্ত থাকায় পুলিশের কাছে যেতে পারেননি। পরের শনিবার তাঁদের ফের

স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়

হাজিরার চিঠি দেয় পুলিশ। তারপরে বিকেল ৫টা নাগাদ সিএবি-র সচিব নরেশ ওঝা এবং আর এক প্রতিনিধি বিশ্বপতি সেন ময়দান থানায় হাজির হন।

দুই কর্মকর্তার হাজিরার আগে ওইদিন বেলা ১২টা নাগাদ লালবাজারে পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের চেম্বারে যান সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। দু'জনের প্রায় আধ ঘণ্টা আলোচনাও হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, ওই আলোচনার পরেই দুই কর্মকর্তা ময়দান থানায় হাজিরা দেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা টিকিট বিক্রি নিয়ে সিএবি-র তরফে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন বলে খবর। পুলিশের সামনে হাজিরা দেন খেলার টিকিট বিক্রির দায়িত্বে থাকা বেসরকারি সংস্থার দুই কর্তাও। তাঁদের বক্তব্য শুনেছেন তদন্তকারীরা এবং টিকিটের হিসেব খতিয়ে দেখছেন। প্রয়োজনে তাঁদের ফের তলব করা হতে পারে বলে পুলিশ জানায়। ১৮,০৭৫টি টিকিট অনলাইনে বিক্রি হয়েছে। 'কমপ্লিমেন্টারি টিকিট' ২০,১৬৮টি। তিন হাজার সদস্যকে অনলাইনে টিকিট দিয়েছে বলে সিএবি-র দাবি। বাকি ২৫,৯৭৫টি টিকিট সিএবি এবং বিসিসিআইয়ের হাতে ছিল। সিএবি-র প্রতিনিধি পুলিশকে জানিয়েছেন, তারা ২৫,৯৭৫টি টিকিট অধীনস্থ ক্লাবগুলিকে বিক্রি করতে দিয়েছিলেন। সিএবি সরাসরি কোনও টিকিট বিক্রি করেনি।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা প্রাক্তন বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ইডেনে দর্শক আসন ৬৭ হাজার। এর পাঁচ গুণ লোক খেলা দেখতে চায়। তারা প্রিমিয়াম প্রাইস দিয়ে টিকিট কিনতে চায়। এটা সিএবি কেন বিসিসিআই কিংবা আইসিসিও আটকাতে পারবে না। তিনি বলেন যে বিশ্বকাপ ফুটবলে তিনি নিজে ১৭ লক্ষ টাকায় টিকিট ব্ল্যাক হতে দেখেছেন। তাই কালোবাজারি নিয়ে সিএবি'কে অভিযোগের কাঠগড়ায় তোলার কোনও কারণ নেই। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিষ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাতেও একই সুর পাওয়া গিয়েছিল। স্নেহাশিষ কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের তাঁবুতে ইডেন নিয়ে একটি বইয়ের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বলেন, টিকিট বণ্টন ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ আইসিসি'র তত্ত্বাবধানে হচ্ছে। সিএবি'র এই বিষয়ে কিছু করার নেই। ইডেনের চার গুণ স্টেডিয়াম করলেও এই চাহিদা মিটবে না।

সূত্রের খবর, তদন্তে যে তথ্য উঠে এসেছে তাতে স্পষ্ট, বিরাট চক্র এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে। পুলিশ কর্তাদের বক্তব্য, 'স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে যোগসাজশ করে

এজেন্টরা অনলাইনে এক লপ্তে বিপুল পরিমাণ টিকিট বহু আগে থেকে কেটে রেখেছেন 'বুক মাই শো'-র সাইট থেকে। সেই টিকিটের অনলাইন সত্ত্ব এখন বিভিন্ন শহরের সাব এজেন্টদের বিক্রি করা হচ্ছে। তাঁদের হাত ঘুরে যখন সাধারণের কাছে সেই টিকিট পৌঁছচ্ছে, তার দাম উঠছে আকাশ ছোঁয়া।

এই চক্রে বিসিসিআই, বিএবির একাংশ থেকে শুরু করে 'বুক মাই শো'র কর্মীদেরও অনেকে যুক্ত থাকতে পারেন বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

এ বিষয়ে জয়েন্ট সিপি (ক্রাইম) শঙ্খশুভ্র চক্রবর্তী বলেন, 'বেশ কিছু তথ্য আমাদের হাতে এসেছে। টিকিটের কালোবাজারিতে যাঁরা জড়িত, তাঁদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।' এ বিষয়ে রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি বলেন, 'এত টিকিট কোথায় গেল এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র ব্যোমকেশ বক্সি দিতে পারবেন। সিএবি একটি স্বশাসিত সংস্থা। এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের কোনও লেন-দেন নেই। বিজেপি শাসিত রাজ্যে ক্রিকেট বোর্ডের সদস্য বিজেপি নেতারা। কিন্তু এখানে সেই ব্যাপার নেই। টিকিট কোথায় গেল, সেটা সিএবি সভাপতি বলতে পারবেন।'

কলকাতায় ম্যাচ থাকলে মাঠের বাইরে টিকিট ব্ল্যাক পরিচিত ছবি। প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনলাইন টিকিট লিঙ্কের মাধ্যমে এখন চলছে জালিয়াতির চক্র। ধরা যাক, কোনও এজেন্ট মুম্বইয়ে বসে 'বুক মাই শো' থেকে টিকিট কিনছেন। এরপর হোয়াটসঅ্যাপে সেই টিকিটের লিঙ্ক বা ই-মেলে আসা পিডিএফ তারা বিক্রি করে দিচ্ছেন অন্য কাউকে।

সেই টিকিটের দাম ওঠা-নামা করছে সাপ-লুডোর মতো। ৯০০ টাকার টিকিট বিক্রি হচ্ছে ১০ হাজারেও। একটি স্লট দেওয়া হয় বুক মাই শো-তে। কিউ-তে শয়ে শয়ে আবেদনকারী অপেক্ষা করছেন, কিন্তু তাঁদের আর টিকিট বুক করতে দেওয়া হয়নি। কয়েক ঘণ্টা পরে সংস্থার তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, সব টিকিট শেষ। সেই টিকিট কারা পাচ্ছে, তা কেউ জানতে পারছে না। গত দু'মাস ধরে এমনটাই হচ্ছে।' তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, বিসিসিআই, সিএবি এবং বুক মাই শো-এর একাংশের সঙ্গে যোগসাজশ করে টিকিটগুলির ভার্চুয়াল সত্ত্ব দর্শকদের ফাঁকি দিয়ে কিনে নেওয়া হচ্ছে কি না।

এই টিকিট কেলেঙ্কারি নিয়ে কলকাতায় ৭টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সম্প্রতি এন্টালি থানার এক মামলার প্রেক্ষিতে ইসলামুল হুডা ওরফে টিঙ্কু এবং হিমল শাহকে মৌলালি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে ১০টি টিকিট উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, হিমল সিএবি-র সদস্য। পুলিশ সূত্রে খবর, নেতাজীনগর থানায় দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয় শুভ্রদীপ ভট্টাচার্য, সুমন সর্দার এবং সন্দীপন লাহাকে। তাঁরা ৯০০ টাকার টিকিট ৮ হাজার টাকায় বিক্রি করছিলেন বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, শহিদ মিনারের সামনে থেকে টিকিটের কালোবাজারির অভিযোগে বছর একুশের দুই যুবক হর্ষ গুপ্তা এবং হর্ষিত আগরওয়ালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অন্যদিকে, হেয়ার স্ট্রিট থানায় একটি অনলাইন সংস্থা থেকে এক ব্যক্তি ৩টি টিকিট ২৫ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলেন বলে অভিযোগ দায়ের হওয়ায় সলমান আলি নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। □

লোভে মৃত্যু

বহুকাল আগে বোধিসত্ত্ব একবার পাখিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পাখিদের রাজা হিসেবে সকলেই তাকে মান্য করত ও খুব ভালোবাসত। তার সুন্দর স্বভাবের জন্য তিনি সকলের কাছেই

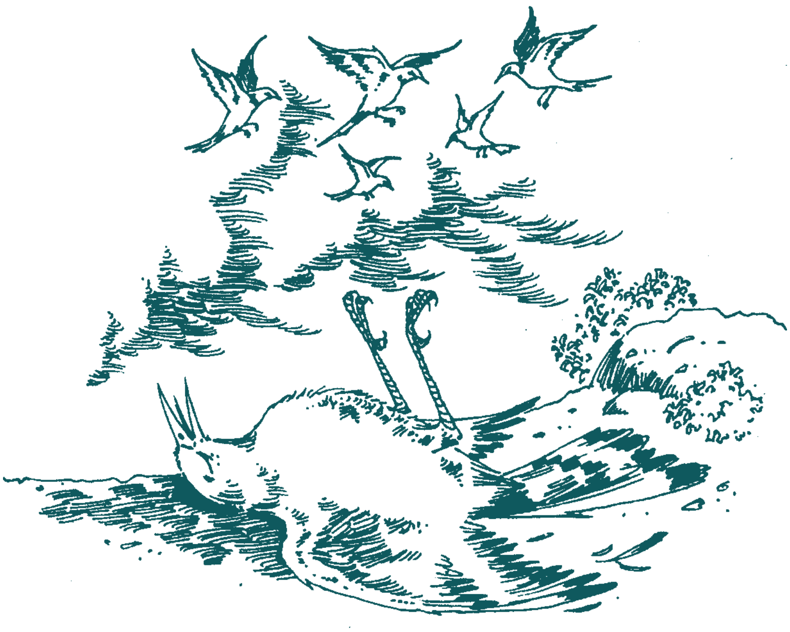

শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

একদিন নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে পাখিদের রাজারূপী বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, কিছুদিনের জন্য সবাইকে নিয়ে অন্য কোনো সুন্দর জায়গায় কাটিয়ে আসবেন। পাখিদের কাছে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব দিতেই সবাই আনন্দে রাজি হয়ে গেল।

নীল আকাশের বুকে ভাসতে ভাসতে তারা একদিন হিমালয়ের কোলে এক গভীর জঙ্গলে হাজির হলো। সবুজ অরণ্যের শোভা দেখে বোধিসত্ত্ব ও অন্যান্য পাখিরা মুগ্ধ হয়ে সেখানেই জঙ্গলে বাসা তৈরি করে থাকতে শুরু করল।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে পাখিরা খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ত। একদিন একটি স্ত্রীপাখি খাবারের সন্ধান করতে করতে হঠাৎ এক রাজপথ দেখতে পেল। পথের ওপর প্রচুর চাল, গম পড়ে থাকতে দেখে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। রাজপথে নেমে সে মনের আনন্দে পেটপুরে চাল, গম খেয়ে বাসায় ফিরল। মনে মনে সে ভাবল, আর কোথাও যাবার দরকার নেই, এখানেই যখন প্রচুর খাবার রয়েছে।

অন্য পাখিরা যাতে রাজপথের ওপর পড়ে থাকা খাবারের সন্ধান না পায় তাই একটা ফন্দি আঁটল। লোভের বশবর্তী হয়ে সে অন্য পাখিদের বলল, ভুলেও তোমরা কোনোদিন রাজপথের দিকে যেয়ো না, সেখানে অনবরত গাড়িঘোড়া চলাচল করছে। চাপা পড়লেই মৃত্যু অনিবার্য।

স্ত্রীপাখিটির কথা শুনে অন্য পাখিরা খুবই সতর্ক হয়ে উঠলো। তারা ভুলেও কোনোদিন রাজপথের দিক গেল না। বোধিসত্ত্বও সবাইকে যেতে মানা করে দিলেন। স্ত্রীপাখিটি কিন্তু লুকিয়ে প্রতিদিন রাজপথে গিয়ে চাল গম খেয়ে আসতে লাগল। ক্রমেই তার লোভ বেড়ে যেতে লাগল।

একদিন স্ত্রীপাখিটি মনের আনন্দে চাল গম খেতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে গাড়ির শব্দ শুনতে পেল। ভাবল, গাড়িটা আসতে একটু দেরি আছে, আর একটু খেয়ে নিই। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। গাড়িটা তাকে চাপা দিয়ে চলে গেল। ওখানেই সে মারা গেল।

সেদিন সন্ধ্যার আগে সব পাখি জঙ্গলে ফিরে এলেও স্ত্রীপাখিটি ফিরে এল না। বোধিসত্ত্ব পাখিদের স্ত্রীপাখিটিকে খুঁজতে পাঠালেন। সবাই তাকে খুঁজতে বের হলো। খুঁজতে খুঁজতে তারা রাজপথের ওপর উড়ে এল। সেখানে তারা স্ত্রীপাখিটিকে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মরে পড়ে থাকতে দেখল।

পাখিরা তাদের রাজা বোধিসত্ত্বকে এই খবর দিল। বোধিসত্ত্ব শুনে খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, স্ত্রীপাখিটি সবাইকে রাজপথে যেতে নিষেধ করত। কিন্তু প্রচণ্ড লোভের বশবর্তী হয়ে নিজেই সেখানে যেত। লোভেই তার মৃত্যু হলো। মনে রেখো, দুঃখ বা মৃত্যুর একটি কারণ হলো লোভ।

সংগৃহীত

বীর বনবাসী

মাদরী কালো

জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামী মাদরী কালো ভুঁইয়া সমাজের মানুষ ছিলেন। তিনি ১৮৪৮ সালে ওড়িশার সুন্দরগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটনাগপুর অঞ্চলের তিনি একজন জমিদার ছিলেন। তিনি তাঁর প্রজাদের খুব ভালোবাসতেন। ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে জনজাতি সমাজের মানুষদের সংগঠিত করে তিনি অস্ত্রধারণ করেন। তিনি মুণ্ডা, খেড়িয়া, গোঁণ্ড প্রভৃতি জনজাতিদেরও সংগঠিত করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৯৭ সালে ইংরেজরা ছল করে তাঁকে বন্দি করে। জেলখানায় তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়। বিকলাঙ্গ অবস্থায় তাঁকে ১৯১০ সালে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯১৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

জানো কি?

- এবারের এশিয়ান গেমস চীনের হ্যাংঝু (Hangzhou) শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- এই গেমসে ৪৮১টি ইভেন্ট ছিল।
- ৪৫টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল।
- ভারতের লক্ষ্য ছিল 'এবার একশো পার'।
- ভারত এবার ১০৭টি পদক জিতেছে (সোনা-২৮, রুপো-৩৮, ব্রোঞ্জ-৪১)।
- পদক তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে চীন।
- চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারত।
- ১০০তম স্বর্ণপদকটি জিতেছে ভারতের মহিলা কাবাডি টিম।

ভালো কথা

ঠাকুমার ভক্তরা

আমার ঠাকুমা প্রতিদিন সকালে স্নান করে পূজায় বসেন। নিজের হাতে করা বাগান থেকে ফুল তুলে নিয়ে আসেন। প্রসাদও ছ'সাত রকমের থাকে। ঠাকুর দেবতাও দশ-বারোজন। একঘণ্টা ধরে পূজা করে ছাদে গিয়ে পিঁপড়ের জন্য চিনি, পাখির জন্য ছোলা ভেজা, পাকা কলা, নকুলদানা আর একবাটি জল রেখে দেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুমার ভক্তরা উড়ে এসে খেতে শুরু করে দেয়। নীচে নেমে এসে আমাদের বাতাসা দেন। ঠাকুমা বলেন, ওই পিঁপড়ে, পাখিরাই তো আমার আসল ভক্ত।

বিবেক সরদার, নবম শ্রেণী, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

বান্ধবী

সোনালি নন্দী, নবম শ্রেণী, ৫৭,কালীমাতা কলোনি, কলকাতা-১০৮

তুই যে আমার প্রিয় সখী
বলি সারাক্ষণ,
সেই ভেবেই তো তোকে আমি
করি জ্বালাতন।
তুই যে আমার খুবই প্রিয়
তুই যে আমার সব,
ডায়েরি ভেবে তোকেই লিখি
আমার কথা সব।
চিরদিনই থাকবো এমন
তুই আর আমি
দুজনের এই বন্ধুত্ব
হয় যে অনেক দামি।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

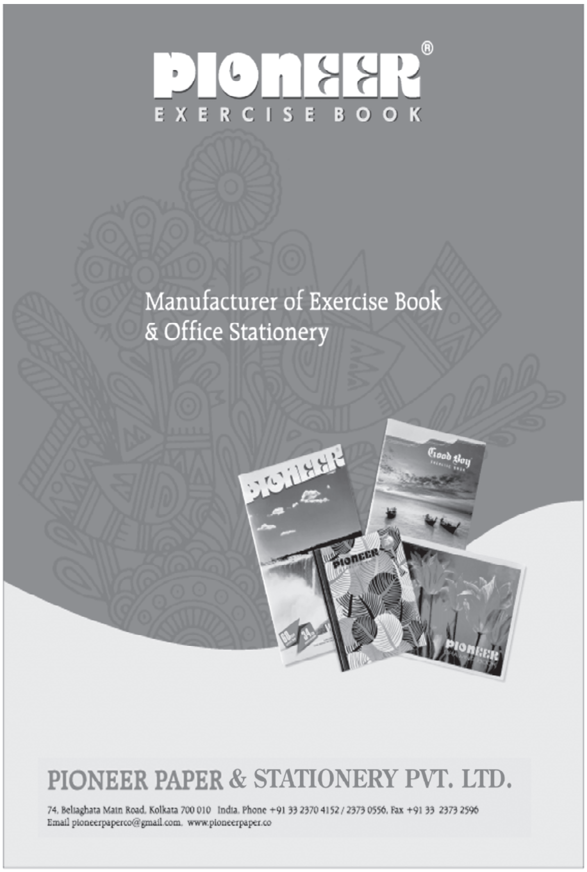

With Best Compliments from -

A

Well wisher

ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দেন সরাইঘাটের সেনানায়ক

দুর্গাপদ ঘোষ

স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা উঠলে সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য লড়াই করা। বিদেশি বা বহিরাগতদের আক্রমণ থেকে মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব হরণের চেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই করাও যে স্বাধীনতা সংগ্রাম এই সহজ-সরল কথাটা বেশিরভাগ লোকেরই ধারণায় আসে না। যাঁরা সেই লড়াই করেন তাঁরাও সে স্বাধীনতা সংগ্রামী এই প্রত্যয় জন্মে না। আমাদের দেশের পরাধীনতার কাল বললে সবাই এটাই বোঝেন যে ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত এই ১৯০ বছর, ক্লাইভের সময় থেকে মাউন্টব্যাটেনের শাসনকাল পর্যন্ত প্রথমে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে শাসিত সময়টুকুই। তার আগে বহিরাক্রমণকারী মুসলমান শাসন, বিশেষ করে মুঘলদের জমানায়ও প্রায় গোটা ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল এবং তা থেকে মুক্তির জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, প্রাণবলি দিয়েছেন তাঁরাও যে এক একজন বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন এটা কেউ যেন ভাবারই চেষ্টা করেন না। উলটে তাঁদের যশকীর্তির কথা ভুলিয়ে দেবার এবং ভুলিয়ে রাখার কৌশলী চেষ্টা চলে এসেছে।

এখনও কিছু বিশেষ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী তা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মুখ্যত এই কারণে মেবারের মহারাণা প্রতাপ সিংহ কিংবা মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মতো অসম তথা বর্তমানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক বীর সেনাপতি লচিত বরফুকনের কথা বিস্মরণের অতলে তলিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত, আচার্য যদুনাথ সরকার, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ কয়েকজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের গবেষণা এবং লেখনীর বলিষ্ঠতার কারণে রাণা প্রতাপ এবং ছত্রপতি শিবাজী ইতিহাসের পাতায় অনেকটা আলোকিত হলেও প্রায় অন্ধকারে থেকে গেছেন লচিত বরফুকন। সাম্প্রতিককালেও দেখা গেছে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের মতো প্রভাবশালী সংস্থাও বাবরি সৌধের মতো একটা বিতর্কিত কাঠামো নিয়ে আলোচনায় যত ফুলঝুরি ফুটিয়েছে প্রায় আক্ষরিক অর্থেই তার কণা পরিমাণও গুরুত্ব দেয়নি মুঘল জমানায় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপোশহীন সংগ্রামী বীর সেনানীদের। হিন্দুপদপাদশাহীর প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ শিবাজী এবং লচিত বরফুকনকে তো যথাক্রমে একজন

ফ ঃ ৬

সাধারণ ‘মারাঠা সর্দার’ এবং ‘জনজাতি মুখিয়া’ চিহ্নিত করে খাটো করার চেষ্টা পর্যন্ত হয়েছে।

১৮৫৭ সনের মহাসংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত নমঃ-নমঃ করে ‘প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম’ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু সেটা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ছিল বলে। মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে হলে আধুনিক কালের পেশাদার ইতিহাস রচয়িতারা ‘কালী মনসা’র দিকে চাঁদ সওদাগরের বাঁ হাতে ফুল ছুঁড়ে দেবার মতো অনীহা সত্ত্বেও এরকম স্বীকৃতি দিতেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তবে এত অন্ধকারের মধ্যেও বছর খানেক আগে এক চিলতে আলোর রেখা দেখতে পাওয়া গেছে। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী এবং অসমে তাঁরই দলের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ হিমন্ত বিশ্বশর্মার শাসনকালে, ২০২২ সালের ২৭ নভেম্বর ‘আত্মনির্ভর ভারত’ গর্বের সঙ্গে বরফুকনের ৪০০তম জন্মজয়ন্তী পালন করেছে। তার ফলে উত্তর-পূর্বের ওই বীর সেনাপতির সংগ্রামের কাহিনি খানিকটা বিদ্যুৎ ঝলকের মতো হলেও ভারতের জাতীয় ইতিহাসের আলোয় উদ্ভাসিত হতে পেরেছে। অথচ দীর্ঘকাল ধরে যাঁকে অবহেলা করে আসা হয়েছে সেই বরফুকনের সংগ্রামের কাহিনি নিতান্ত হেলাফেলা করার মতো নয়। রীতিমতো সেনাসম্ভার নিয়ে যুদ্ধ করে সে সময়কার অপরাজেয় মুঘল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে রণেভঙ্গ দিতে বাধ্য করেছেন তিনি। অক্ষুণ্ণ রেখেছেন অসম-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বভৌমত্বকে। ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকেও।

এট ঠিক, যে কালে অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও ব্রিটিশ শাসন কায়েম হয়েছিল, সে সময়কার উপনিবেশবাদী ব্রিটিশরা বলপ্রয়োগের পাশাপাশি কৌশল এবং ছলচাতুরি করে অসমকেও তাদের শাসনক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। তবে পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পর তা করতে সময় লেগেছিল প্রায় ৭০ বছর। অঞ্চলটা ব্রিটিশদের অধীনে চলে যায় ১৮২৬ সালে। তার আগে পর্যন্ত উত্তর তো বটেই দক্ষিণ ভারতেরও অনেক অঞ্চল চলে গিয়েছিল মুসলমান এবং তাঁদের অনচরবর্গ সুলতান, নবাব ও নিজামদের দখলে। কিন্তু অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মুসলমানরা এমনকী দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী মুঘলরাও শাসন কায়েম করতে পারেনি। তার মানে এই নয় যে তারা সে চেষ্টা চালায়নি। বিশেষ করে মুঘল আমলে অসমের ওপর বেশ কয়েকবার আক্রমণ হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই তা প্রতিহত করেছেন সেখানকার জনজাতির শাসকরা। কখনো রুদ্রনারায়ণের মতো ছোটোখাটো আবার কখনো চক্রধ্বজ সিংহ’র মতো বড়ো রাজারা। বেশিরভাগ সময়ই দেখা গেছে ছোটো ছোটো এলাকার জনজাতির শাসকরা তাদের সীমিত শক্তি নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বড়ো রাজাদের সঙ্গে মিলে বহিরাক্রমণকারী মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে খেদিয়ে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, বড়ো বড়ো কামানের মতো ভারী অস্ত্র এবং প্রশিক্ষিত ও পেশাদার সেনাবাহিনী ছিল মুঘলদের মোক্ষম হাতিয়ার। কিন্তু অদম্য সাহস, কিছুটা গেরিলা যুদ্ধের কৌশল এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ করা সংগ্রামের কাজে মুঘল বাহিনী এককথায় দাঁত ফোটাতে পারেনি। শেষ চেষ্টা করেছিলেন কুখ্যাত মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেব। কিন্তু সরাইঘাটের যুদ্ধে তাঁর প্রশিক্ষিত ও অস্ত্রসজ্জিত বিশাল বাহিনীকে পর্যদস্তু হয়ে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হতে হয় ‘আহোম খিলজিয়া’ বা অসমীয় ভূমিপুত্র, সেনানায়ক লচিত বরফুকনের কাছে।

সময়টা ১৬৭১ সাল। তার কয়েক বছর আগেই আহোমরাজ চক্রধ্বজ সিংহ তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেন বরফুকনকে। জনজাতির এই দুঃসাহসী বীরকে সেনাপতি করে চক্রধ্বজ যে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন সময়ে তা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু পেশাগত ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস দীর্ঘকাল ধরে তাঁকে আলোকিত করেনি। পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসেনি। এই কারণেও লচিত বরফুকনের বীরত্ব তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বার বার স্মরণ করা, তাঁকে সবার সামনে বার বার তুলে ধরা কেবল দরকার তাই নয়, এটা একটা জাতীয় কর্তব্যও বটে।

আহোমরাজ চক্রধ্বজের আমলে মুঘলরা একের পর এক আক্রমণ শানিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে অসমের কোনো কোনো অংশ দখল করে নিয়েছিল। তবে তাদের জবরদখল করা অংশগুলোতে নিরঙ্কুশ শাসন কায়েম করতে পারেনি। তাই তা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল ঔরঙ্গজেব। রাজা চক্রধ্বজের সেনাবাহিনী তেমন একটা প্রশিক্ষিত কিংবা পেশাদার ছিল না। ছিল না মুঘল বাহিনীর মতো বিপুল ও ভারী অস্ত্রসম্ভারও। ভরসা ছিল বর্শা, তলোয়ার, সেই পুরনো আমলের কিছু গাদা বন্দুক আর বারুদ ঠাসা কিছু হালকা ছোটো কামান। অসমের ধারেকাছে কোথাও সমুদ্র না থাকায় ছিল না কোনও নৌ-বাহিনীও। কথাগুলো এই কারণে জানানো জরুরি যে ঠিক কীরকম পরিস্থিতিতে এবং কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হয়েছিল লচিতের নেতৃত্বাধীন অসমীয় সেনাদের। পরাজয় একরকম প্রায় নিশ্চিত জেনেও সেনাপতিত্বের মতো মহাদায়িত্ব নিতে একবারও চিন্তা করেননি, এক কদমও পিছু-পা হননি লচিত। তাঁর কাছে কর্তব্য ছিল একটাই— রাজাদেশ শিরোধার্য করা। লক্ষ্য ছিল একটাই— মাতৃভূমির স্বাধীনতা হরণকারীদের পরাভূত করে মাতৃভূমির পবিত্রতা রক্ষা করা। সেনাপতির দায়িত্ব পাবার পর ১৬৬৫ সালে অধীনস্থদের নিয়ে একটা বৈঠক করে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন, ‘আমি কোনও বিদেশি প্রভুর দাসত্ব করার জন্য জন্মগ্রহণ করিনি। আমি কেবলমাত্র আমাদের ঈশ্বরতুল্য রাজার অনুগত সৈনিক। আমার কাছে আমার মাতৃভূমির পবিত্রতা রক্ষাই প্রধান কর্তব্য।’

কেউ কেউ মনে করেন মুঘলদের সামরিক শক্তি এবং পেশাদারিত্ব দেখে আহোম সেনারা কিছুটা বিভ্রান্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছিল। আর কিছুদিন ওইভাবে চললে গোটা অসম হয়তো মুঘলদের পদানত হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন লচিত। ১৬৬৫ থেকে ১৬৭১, পাঁচ-ছ’ বছরের মধ্যে আহোম সেনাবাহিনীর দেহে নতুন রক্ত সঞ্চারিত করে নতুন কলেবর দিয়েছিলেন। নতুন ভাবে সঞ্জিবিত ও উজ্জীবিত করেছিলেন তাঁর ইচ্ছা এবং ত্যাগশক্তির জোরে। ১৬৭১ সালের মার্চ মাসে উল্লেখিত সরাইঘাটের যুদ্ধে অচিন্তনীয়ভাবে ঔরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে রণে ভঙ্গ তিতে বাধ্য করেছিলেন। শিবাজী মহারাজের মারাঠা বাহিনী ছাড়া ঔরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীকে এইভাবে বিধ্বস্ত করার ঘটনা নিতান্ত বিরল। যুদ্ধ তিনি অনেকবারই করেছেন। কিন্তু সরাইঘাটের যুদ্ধ একটা মাইল ফলক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে।

সেনাপতির দায়িত্ব পাবার পর লচিত প্রথম যে কাজটি করেন তাহলো অতি বিশ্বস্তদের নিয়ে একটা গুপ্তচর বাহিনী গঠন করা। যাদের প্রধান কাজ ছিল মুঘল বাহিনীর রণকৌশলের দিক সন্ধান করা। যুদ্ধক্ষেত্রে মুঘলদের দুর্বলতার ফাঁক-ফোঁকর খুঁজে বার করা এবং তাদের অগ্রগতির প্রধান কারণগুলো অনুসন্ধান করে তাঁকে নিয়মিত জানানো। যাতে তিনিও তাঁর রণকৌশল সাজাতে পারেন।

মোঘল সেনাদের বিভ্রান্ত করতে পারেন। বেছে নেন প্রধানত গেরিলা যুদ্ধের কায়দা—আচমকা হামলা করে নিরাপদ জায়গা এবং দূরত্বে সরে যাওয়া। ইংরেজিতে যাকে বলে হিট অ্যান্ড রান এবং রিট্রিট পলিসি। নিজেদের সুবিধা এবং উপযুক্ত সময় বুঝে ঘন ঘন যুদ্ধের স্থান বদলে ফেলে শত্রুবাহিনীকে দিগ্‌ভ্রান্ত করে যেতে থাকা। অনবরত এদিকে সেদিকে দৌড়ঝাঁপ করানো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুঘল সেনাবাহিনীর রণকৌশলের মধ্যে একটা ফাঁক ছিল এই যে তাদের নিজেদের শক্তি সম্পর্কে তাঁরা অতিরিক্ত বেশি মাত্রায় আস্থাশীল। সামনাসামনি যুদ্ধ করে বীরত্ব ও নৃশংসতা প্রদর্শনের মনোভাব খুব বেশি মাত্রায় থাকার কারণে প্রতিপক্ষ যেখানে অবস্থান করছে সেদিকে ধাওয়া করে তাদের আক্রমণ করা। মুঘল বাহিনীর এই মানসিকতার দিকটা অনুধাবন করেই বরফুকন তাঁর বাহিনীকে নিয়ে অবস্থান করেছিলেন সরাইঘাটে। তিনি জানতেন ঔরঙ্গজেবের সেনারা সেখানে ছুটে আসবে। মুঘলদেরও যে গুপ্তচর বাহিনী আছে এটা বুঝতে তেমন সময় লাগেনি তাঁর। তাই কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে খুব গোপনে তৈরি করেন ছোটোখাটো একটা নৌ-বাহিনী।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি খাটিয়ে নিজেদের নৌকোগুলোকে আড়ালে লুকিয়ে রাখার জন্য গুয়াহাটির দীঘলিপুকুরিকে একটা বন্দরের মতো বানিয়ে নেন। খরস্রোতা ব্রহ্মপুত্র নদের স্রোতের টানে নৌকোগুলো যাতে ভেসে না যায় এবং শত্রুপক্ষের নজরে না পড়ে সেজন্যই গুপ্ত জলাশয় হিসেবে বেছে নেন তখন তার চারিদকে গভীর জঙ্গলে ঢাকা একটা বৃহৎ জলাশয় দীঘলিপুকুরিকে। তাছাড়া দীঘলিপুকুরির অবস্থান ব্রহ্মপুত্রের প্রায় ধারেই। উল্লেখ্য, গুয়াহাটি রেল স্টেশন ও কাছারিবাড়ির প্রায় লাগোয়া এই জলাশয়ের সংস্কার করে এখন তাকে একটা আকর্ষণীয় পর্যটনের জায়গা বানানো হয়েছে। লচিত বরফুকন সরাইঘাটকে যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এই কারণে যে ব্রহ্মপুত্র নদের এই জায়গাটা হলো সবচাইতে কম চওড়া এবং সেখানে নদীর একটা বাঁক (Swan neek)-এর মতো রয়েছে। ফলে শত্রুপক্ষের কে কোথায় রয়েছে বেশি দূর থেকে তা দেখতে পাওয়া যায় না। উপরন্তু জায়গাটা দীঘলিপুকুরি থেকে তেমন একটা দূরেও নয়। যুদ্ধ বাধলে দেখতে না দেখতে দীঘলিপুকুরি থেকে তাঁর নৌ-বাহিনী চলে আসতে পারবে। সরাইঘাটের যুদ্ধে ওই নৌ-বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে ঔরঙ্গজেবের বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে দেয় আহোম বাহিনী। যুদ্ধ শুরু হতেই আচমকা যমদূতের মতো এসে হাজির হয় লচিতের নৌ-বহর। ফলে মোঘল সেনারা দিশাহারা হয়ে পড়ে। লচিতের সেনাবাহিনীতে এরকম একটা যে নৌ-বাহিনীও রয়েছে এটা মোঘলদের ধারণার বাইরে ছিল।

অসমের ওপর বার বার আক্রমণ করে সুবিধা না করতে পারলেও রণপিপাসু ঔরঙ্গজেবের ধারণা হয়েছিল নিতান্ত জনজাতির সর্দার কিংবা রাজারা দিল্লিশ্বরের প্রশিক্ষিত ও পারদর্শী সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারবে না। বিশেষত তার আগে কিছু কিছু জায়গা জবরদখল করে নিতে পেরে ঔরঙ্গজেবের জয় সম্পর্কে রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী এবং নিশ্চিত ছিল। সেজন্য তার মামা শায়েস্তা খাঁ কিংবা রাজা জয়সিংহের মতো বড়ো সেনাপতিদের না পাঠিয়ে মুঘল বাহিনীর সেনাপতি করে পাঠিয়েছিল রাম সিংহকে। এদিকে লচিত খবর নিয়ে জানতে পেরেছিলেন যে মুঘল সেনারা সমতলভূমিতে দুর্ধর্ষ হলেও জলযুদ্ধে তেমন পারদর্শী নয়। গুপ্ত নৌ-বাহিনী গড়ে তোলার প্রধান কারণও ছিল এটাই। সেজন্য যুদ্ধস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ব্রহ্মপুত্রের বাঁক সরাইঘাটকে। এমনিতে এলাকাটা মুখ্যত সমতলভূমি হলেও নদী তাঁর সহায়ক হতে পারে বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। আর সেখানে ঘাঁটি গেঁড়ে রটিয়ে দিয়েছিলেন যে বিশাল সংখ্যক মুঘল সেনা এবং তাদের ভারী অস্ত্রসম্ভারের ভয়ে আহোম সেনারা পালিয়ে গিয়ে জমা হয়েছে সরাইঘাটে। এই কৌশলে রণপিপাসু মুঘল সেনাদের সেখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ করেই নৌকোগুলো থেকে হালকা কামানের গোলা দাগতে শুরু করেন। ফলে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় ঔরঙ্গজেবের সেনাবাহিনী। সেই সুযোগে অস্ত্র হাতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আহোম সেনারা। তুলনামূলকভাবে অনেক কম সেনা এবং সামান্য রণসম্ভার সত্ত্বেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং মাতৃভূমির প্রতি অসীম ভক্তির জোরে মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করেন আহোম সেনাপতি লচিত বরফুকন। তাঁর কাছে এই যুদ্ধ ছিল হয় মোঘল বাহিনীকে পরাস্ত করা অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করে বীরগতি লাভ করা (Do or die)।

তাই মধ্যযুগে, এখন থেকে ৩৫২ বছর আগে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে সরাইঘাটের যুদ্ধকে অন্যান্য যুদ্ধের মতো কেবলমাত্র একটা যুদ্ধ হিসেবে দেখাটা ঠিক হবে না। এটাকে ভারতবর্ষের জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষার ক্ষেত্রে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। কেননা ওই যুদ্ধজয় অসম-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে মুঘলদের পদানত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। ভারতের বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও এদিকে আলোকপাত করেছেন। ২০২২ সালের ২৩ নভেম্বর লচিত বরফুকনের ৪০০তম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে চিন্তাশীল ও ইতিহাসের জ্ঞান রাখা রাজনীতিবিদ শ্রীশাহ কোনোরকম দ্বিধাসংকোচ না করে বলেছেন, 'সেই সময় অখণ্ড অসমে বীর লচিত বরফুকন যদি না থাকতেন তাহলে অসম-সহ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল কখনোই ভারতের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ থাকতো না।' কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও খেদের ব্যাপার হলো, ভারতের অখণ্ডতা রক্ষাকারী এরকম একজন দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামীর যশকীর্তির কথা এবং তাঁর মহান জীবনগাঁথা সুদীর্ঘ সাড়ে তিনশো বছর ধরে আঞ্চলিক ক্ষেত্রের বাইরে তেমন ভাবে প্রকাশ পায়নি। পাদপ্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়নি। ভারতের অন্যতম প্রধান সেনানায়ক হিসেবে তো নয়-ই। □

প্যালেস্তাইন-ইজরায়েল সঙ্ঘাতের মূলে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ

সুব্রত মণ্ডল

গত ৭ অক্টোবর প্যালেস্তাইনে গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণকারী জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস ইজরায়েল ভূখণ্ডে ভোরে ২০ মিনিটের মধ্যে

৫০ হাজার মিসাইল নিক্ষেপ করে। অতর্কিত হামলা চালানোর পর সেদিন থেকেই গাজায় প্রত্যাঘাত শুরু করে ইজরায়েলের বিমান বাহিনী। সেই অভিযান এখনও চলেছে।

হামাসের হামলায় ইজরায়েলে নিহত হয়েছেন ১ হাজার ৪০০ জনেরও বেশি ইজরায়েলি ও অন্যান্য দেশের নাগরিক। এছাড়া হামলার প্রথম দিনই ইজরায়েল থেকে অন্তত ২৩৪ জনকে জিম্মি হিসেবে গাজায় পণবন্দি করেছে হামাস। অন্যদিকে, ইজরায়েলি বিমান বাহিনীর অভিযানে গাজায় নিহতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ১০ হাজারের বেশি। এই নিহতদের অর্ধেকেরও বেশি শিশু ও নারী।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষকদের মতে, ১৯৫৩ সালের আরব-ইজরায়েল যুদ্ধের পর এই প্রথম এত বড়ো মাত্রার সংঘাত হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের আল-আকসা অঞ্চলে। বিমান বাহিনীর হামলায় গত এক মাসে গাজা উপত্যকায় বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ১৫ লক্ষ মানুষ। তাদের মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষ UNRWA পরিচালিত স্কুলগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন।

শুরুতে কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়লেও পরে দ্রুত গাজায় প্রত্যাঘাত শুরু করে ইজরায়েল। দেশটি আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করে হামাসের বিরুদ্ধে। সেই থেকে গাজায় মুহুর্মুহু হামলা চালানো হচ্ছে। এসব হামলায় গাজায় ধসে পড়ছে একের পর এক স্থাপত্য। দেখা দিয়েছে মানবিক সংকট। প্রাণ গেছে নারী ও শিশু-সহ হাজারের বেশি সাধারণ মানুষের। যুদ্ধ শুরুর পর গাজাকে কার্যত অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এর পরিণতিতে আরও অসংখ্য প্যালেস্তাইনি জঙ্গিকে নিকেশ করবে ইজরায়েল। শক্তিশালী ইজরায়েলের পেছনে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র-সহ বহু দেশ। প্যালিস্তাইনিদের সঙ্গে রয়েছে ইরান ও আফগানিস্তান- সহ বিভিন্ন ইসলামি দেশ। শেষ পর্যন্ত বহুগুণ ক্ষতির মুখে পড়বে সাধারণ প্যালেস্তাইনিরা।

প্যালেস্তাইনের গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণকারী জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে ইজরায়েলের চলমান যুদ্ধ কবে নাগাদ শেষ হবে, তা কেউই জানে না; তবে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অনির্দিষ্টকালের জন্য গাজার সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবে ইজরায়েলের হাতে। এ তথ্য জানিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। একই সঙ্গে আরও একবার গাজায় যুদ্ধবিরতি আহ্বানের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেন, 'গাজা উপত্যকার শাসনক্ষমতায় তাদেরই থাকা উচিত, যারা হামাসকে অনুসরণ করতে ইচ্ছুক নয়। আমি মনে করি, গাজার সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব ইজরায়েলের হাতে থাকা উচিত এবং তা অনির্দিষ্টকালের জন্য। কারণ সম্প্রতি যা ঘটছে, তা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ছিল না। আমরা এমনটা চাইনি।'

ইজরায়েলি সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, হামাসকে পুরোপুরি নির্মূল করার আগে পর্যন্ত এই যুদ্ধ তারা থামাবে না। যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা ইজরায়েলের এই অবস্থানকে সমর্থনও করেছে। তবে রাশিয়া, চীন, মধ্যপ্রাচ্য-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ শুরু থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতির সোচ্চার আহ্বান জানিয়ে আসছে।

এক সাক্ষাৎকারে এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে নেতানিয়াহু বলেন, 'ছোটোখাট কৌশলগত বিরতি হতেই পারে, হয়তো এক ঘণ্টা বা তার কিছু বেশি সময়...অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি গাজায় ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা পাঠানো এবং মুক্তি পাওয়া পণবন্দিদের গাজা থেকে বের হতে যতক্ষণ সময় লাগবে ততক্ষণ। কিন্তু আমি মনে করি না সেখানে একটি সাধারণ যুদ্ধবিরতি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে।'

সেই সঙ্গে ইরান ও হিজবুল্লাহকে এই যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার সতর্কবার্তা দিয়ে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি আশা করব— তারা বুঝবে যে এই যুদ্ধে যদি তারা জড়িয়ে পড়ে, তাহলে আমরা খুব, খুবই শক্তভাবে তার প্রতিক্রিয়া জানাব এবং আমার মনে হয় না তারা সেই ভুল করবে।'

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপে বসবাসকারী ইহুদিরা ব্যাপক বিদ্বেষ-নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। সেখান থেকেই 'জিয়োনিজম' বা ইহুদিবাদী আন্দোলনের শুরু। তাদের লক্ষ্য ছিল ইউরোপের বাইরে কেবলমাত্র ইহুদিদের জন্য একটি দেশ পত্তন করা। সেই সময় প্যালেস্তাইন ছিল তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের অধীন। এটি ইসলাম, ইহুদি ও খ্রিস্টান এই তিন মতের মানুষের কাছেই পবিত্র ভূমি হিসেবে বিবেচিত।

জেরুজালেম নগরীর প্রাচীন অংশে ইসলাম, ইহুদি ও খ্রিস্টান তিন উপাসনা পদ্ধতিরই গুরুত্বপূর্ণ শিকড় রয়েছে। ইহুদিবাদী আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইউরোপের ইহুদিরা দলে দলে প্যালেস্তাইনে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। কিন্তু তাদের এই অভিবাসন স্থানীয় আরব ও মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করে। সে সময় আরব ও মুসলমানরাই ছিল সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্য কার্যত ভেঙে পড়ে। তখন যে লিগ অব নেশন গঠিত হয়েছিল, সেই বিশ্ব সংস্থার পক্ষ থেকে ব্রিটেনকে 'ম্যান্ডেট' দেওয়া হয় প্যালেস্তাইন শাসন করার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছিল তখন ব্রিটেন, আরব ও ইহুদি— উভয় পক্ষের কাছেই নানারকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্যালেস্তাইন নিয়ে। কিন্তু এসব প্রতিশ্রুতির কোনোটিই ব্রিটেন রক্ষা করেনি। পুরো মধ্যপ্রাচ্য তখন কার্যত ভাগবাঁটোয়োরা করে নিয়েছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্স। এই দুই বৃহৎ শক্তি পুরো অঞ্চলকে তাদের মতো করে ভাগ করে নিজেদের প্রভাব বলয়ে ঢোকায়। প্যালেস্তাইনে তখন আরব ও ইহুদিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়। ইহুদি ও আরব মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। জেরুজালেমের প্রাচীন অংশে ব্রিটিশদের হাতে বন্দি হয় একদল আরব।

অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর প্যালেস্তাইন ব্রিটিশদের অধীনে চলে যায়। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যেভাবে লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা হয় (হলোকস্ট) তারপর ইহুদিদের জন্য একটি স্বতন্ত্র দেশ প্রতিষ্ঠায় চাপ বাড়তে থাকে। ইহুদিরা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী বাইবেলে বর্ণিত পিতৃপুরুষ আব্রাহাম এবং তার বংশধরদের জন্য যে পবিত্রভূমির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেই ভূমি দাবি করে। প্রাচীনকাল থেকেই অবশ্য এই ভূমি নিয়ে সংঘাত চলছে।

ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনে থাকা অঞ্চলটি তখন প্যালেস্তাইনি আর ইহুদিদের মধ্যে ভাগ করার সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ১৯৪৮ সালের ১৪ মে প্রতিষ্ঠিত হয় ইজরায়েল দেশ। কিন্তু পরদিনই মিশর, জর্ডন, সিরিয়া ও ইরাক মিলে অভিযান চালায় ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনে থাকা অঞ্চলে। সেটাই ছিল প্রথম আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ। ইহুদিদের কাছে এটি স্বাধীনতার যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্যালেস্তাইনে আরবদের জন্য একটি স্বতন্ত্র দেশ প্রতিষ্ঠায় যে অঞ্চলটি বরাদ্দ করেছিল, এই যুদ্ধের পর তার অর্ধেকটাই চলে যায় ইজরায়েল বা ইহুদিদের দখলে। প্যালেস্তাইনের জাতীয় বিপর্যয়ের শুরু সেখান থেকে। এটিকেই তারা বলে 'নাকবা' বা বিপর্যয়। প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ প্যালেস্তাইনিকে পালিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলিতে আশ্রয় নিতে হয়। ইহুদি বাহিনী তাদের বাড়ি-ঘর থেকে উচ্ছেদ করে। কিন্তু আরব আর ইজরায়েলিদের মধ্যে এটা ছিল প্রথম যুদ্ধ মাত্র। এই সঙ্গে তাদের মধ্যে এক দীর্ঘমেয়াদি সংঘাতের সূচনা হলো মাত্র।

নিরুপায় না হলে কোনো সম্প্রদায় তাদের জন্মভূমি ছাড়তে চায় না। ইহুদিরা কেন জন্মভূমি ত্যাগ করল?

প্রথমত, রোমানদের নির্যাতনের প্রচুর ইহুদি বিভিন্ন আরব দেশে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, নবি মুহাম্মদ ও খলিফায়ে রাশেদিনের সময়েও পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের নির্যাতনে ইহুদিরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে যায়। তৃতীয়ত, খলিফা ওমর যখন ইজরায়েল দখল করেন তখন ব্যাপক হারে ইহুদি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইজরায়েল প্রায় ইহুদি শূন্য হয়ে পড়ে।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ব্রিটিশ রাজকুমারী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরপর তিনজন ডাক্তারের চিকিৎসাতেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। এই সময় এক ইহুদি ডাক্তার তার চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। তার চিকিৎসাধীনে রাজকুমারী সুস্থ হয়ে উঠলে রাজা ডাক্তারকে বললেন, 'তুমি কী চাও'। ডাক্তার বললেন, মহারাজ, আমি নিজের জন্য কিছুই চাই না। আমি চাই ইহুদিদের জন্য একটি দেশ। দেশের অবস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে ডাক্তার বললেন, 'আমরা আমাদের সেই প্রাচীন ভূমিতে ফিরে যেতে চাই'।

তখন রাজা আশ্বাস দিয়ে বললেন, তোমরা সেখানে জমি ক্রয় করে বসবাস শুরু কর এবং দেশ গঠনের লক্ষ্যে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি কর। এই ব্যাপারে কোনো প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হলে আমরা তোমাদের পূর্ণ নিরাপত্তা দেব। ১৯২০ থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ বেসামরিক প্রশাসন প্যালেস্তাইন পরিচালনা করত। এই সময় অঞ্চলটি প্যালেস্তাইন তথা ফিলিস্তিন নামে পরিচিত ছিল। ১৯৩০-এর দশকের পর প্যালেস্তাইন বুঝতে পারলো যে, তারা প্রচুর জমি হারিয়েছে। ইহুদিরা দলে দলে সেখানে আসে এবং জমি ক্রয় করতে থাকে। কারণ প্যালেস্তাইনিরা তাদের অনুর্বর ভূমিসমূহ ইহুদিদের কাছে বিক্রি করে লাভবান হচ্ছিল। এইভাবে ইহুদিরা পর্যাপ্ত জমি ক্রয় করে ফেলে।

প্যালেস্তাইনের অধিকাংশ ভূমি ছিল অনুর্বর ও চাষাবাদের অনুপযুক্ত। সেখানে ম্যালেরিয়ার এতোটাই প্রকোপ ছিল যে মশার কামড়ে প্রচুর লোক মারা যেত। অধিকাংশ জমির মাটিতে পাথর মেশানো ছিল। ইহুদিরা ছিল পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান। তারা এই সমস্ত জমির মাটি থেকে পাথর সরিয়ে পুরো জমিতে জল সেচ করে ম্যালেরিয়া নির্মূল করে সেগুলিকে উর্বর জমিতে পরিণত করে। পোকামাকড় ও রোগবালাই ধ্বংসের লক্ষ্যে

আধুনিক মেশিন দ্বারা মাটিকে তাপ দিয়ে জীবাণুমুক্ত করত, প্রচুর পাখি পালন করে তাদের দ্বারা কীটপতঙ্গ নির্মূল করত এবং মৌমাছি চাষ করে পরাগায়ন ঘটানোর মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করত। তারপরও আরবরা ইহুদিদের অপছন্দ করত।

প্রথমত, মুসলমানরা অধিকাংশই দেশেই ছিল রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের সমর্থক। আশেপাশের কোনো দেশেই সভ্য রীতিনীতি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিল না।

দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের ইহুদি-বিদ্বেষ ছিল জন্মলগ্ন থেকেই। সুতরাং চারপাশে ইসলামি দেশের মাঝখানে একটি ইহুদি বসতি গড়ে উঠবে তারা এটি পছন্দ করতে পারেনি।

তৃতীয়ত, আশঙ্কা ছিল ইজরায়েলে উন্নত গণতান্ত্রিক পরিবেশ আরব দেশগুলোতেও প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে গদি নিয়ে সমস্যা হতে পারে।

ইহুদিদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাবার পরে যখন তাদের আশঙ্কা হলো ইজরায়েল দেশ হিসেবে ঘোষণা করতে পারে, তখন তারা শর্ত দিল এখানে বসবাস করা যাবে কিন্তু দেশ ঘোষণা করা যাবে না। এই সময়ে ইহুদি ও প্যালেস্তাইনিদের মধ্যে নানাবিধ সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ১৪ মে প্যালেস্তাইন ছেড়ে চলে যায় ব্রিটেন। একই দিন তৎকালীন নেতারা ঘোষণা করেন, 'আজ রাতেই ইহুদি দেশের জন্ম হবে'।

ইজরায়েলের জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যেই আরবরা আক্রমণ শুরু করে। একসঙ্গে পাঁচটি আরব দেশ ইজরায়েলকে আক্রমণ শুরু করে। দেশগুলো হলো— মিশর, ইরাক, লেবানন, জর্ডন ও সিরিয়া। নব্য স্বাধীনতা ঘোষণাকারী এই দেশের কোনো সামরিক বাহিনী ছিল না। সাধারণ মানুষ অস্ত্র নিয়ে লড়াই করে জয়লাভ করতে পারে না। তাই এই যুদ্ধে মিশর সিনাই উপত্যকা, সিরিয়ার গোলান মালভূমি এবং জর্ডন নদীর পশ্চিম তীর এবং গাজা দখল করে নেয়। এই সময়ে আরব ও ইজরায়েলিরা পাশাপাশি অবস্থান করতে। তাই যুদ্ধে আরবরা যে সমস্ত ভূমি দখল করলো সেখানকার ইহুদিরা অন্যান্য অঞ্চলের ইহুদিদের নিকট চলে গেল। কিন্তু প্যালেস্তাইনিরা প্যালেস্তাইনিদের কাছে আশ্রয় না পেয়ে তারা চলে গেল উদ্বাস্তু হিসেবে লেবাননে। এভাবেই চালু হয়েছিল লেবাননের রিফিউজি ক্যাম্প।

মুসলমান দেশগুলো এতটাই স্বার্থপরতা দেখালো যে, তারা দখলীকৃত জায়গা প্যালেস্তাইনিদের বরাদ্দ না করে বরং সেগুলোকে নিজেদের দেশের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে ফেলল। তাদের এই স্বার্থপরতায় ইয়াসির আরাফাত দুঃখ পেয়েছিলেন। এরপর ১৯৬৭ সালে দ্বিতীয় আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তখন ইজরায়েলে একটি প্রশাসনিক কাঠামো ছিল। সেই যুদ্ধে ইজরায়েল আরবদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করে পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা সিনাই উপদ্বীপ ও গোলান মালভূমি পুনর্দখল করে নেয়।

ইজরায়েল সেই উদ্ধারকৃত ভূমি প্যালেস্তাইনিদেরকে বরাদ্দ করে। ১৯৭৮ সালে আমেরিকায় মিশর ও ইজরায়েল ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। সৃষ্টি হয় ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন নামে দুটি আলাদা দেশ। এরপর ১৯৯৩ সালে ইজরায়েল এবং পিএলও একে অপরকে স্বীকৃতি দেয়।

প্যালেস্তাইন কি কোনো দেশ?

২০১২ সালের ২৯ নভেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব পাশ হয়। এতে প্যালেস্তাইনিদের 'নন মেম্বার অবজার্ভার স্টেট' বা পর্যবেক্ষক দেশের মর্যাদা দেওয়া হয়। এর ফলে প্যালেস্তাইনিরা এখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের বিতর্কে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। তারা রাষ্ট্রসঙ্ঘের অঙ্গ সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগুলির কাছেও অংশ নিতে পারে। ২০১১ সালে অবশ্য একটি পূর্ণ সদস্য দেশ হিসেবে প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বীকৃতি পাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের আপত্তির কারণে সেই চেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বীকৃতি না মিললেও এই বিশ্ব সংস্থার ৭০ ভাগ সদস্য দেশই প্যালেস্তাইনকে একটি দেশ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে (সাধারণ পরিষদের ১৯২টি দেশের ১২৩টি দেশ)। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সদর দপ্তরের বাইরে প্যালেস্তাইনি জাতীয় পতাকা উত্তোলনেরও স্বীকৃতি মেলে।

সম্প্রতি ইজরায়েলে হামাসের হামলা এবং এর জবাবে গাজায় ইজরায়েলের লাগাতার প্রত্যাঘাতের ঘটনায় প্যালেস্তাইনিদের পক্ষে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে বিক্ষোভের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে।

যদিও আসল ঘটনা হলো, প্যালেস্তাইনি জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কয়েক দশক ধরে মতবিরোধ চলছে। এ কারণেই তাদের পক্ষে নিজেদের জন্য আলাদা শাসন প্রতিষ্ঠার মতো প্রধান লক্ষ্যগুলি অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ছে বলে মনে করা হয়। প্যালেস্তাইনের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এই দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল ২০০৭ সালের জুন মাসে। সে সময় গাজা উপত্যকায় হামাস ও ফাতাহর লড়াইয়ে বহু মানুষ হতাহত হয়েছিল। এই সশস্ত্র সংঘাত, 'গাজার যুদ্ধ' নামেও পরিচিত। এই লড়াই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এত গভীর বৈরিতা সৃষ্টি করেছিল যে সেই সংঘাতের চিহ্ন আজও বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

২০০৬ সালে প্যালেস্তাইনের পার্লামেন্ট নির্বাচনে ফাতাহ হেরে যাওয়ার পর এবং হামাস যোদ্ধারা গাজার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর এই সংহিংসতা শুরু হয়। ওই সংঘাতের ফলে প্যালেস্তাইনের যৌথ সরকারের বিলুপ্তি ঘটে এবং প্যালেস্তাইনি ভূখণ্ডে শাসনভার ভাগ হয়ে যায়। প্যালেস্তাইনের দুই অংশ— পশ্চিমতীর ফাতাহ আর গাজা হামাসের শাসনে চলে যায়। প্যালেস্তাইনের বিভিন্ন ইসলামি গোষ্ঠীর মধ্যে হামাস হলো সবচেয়ে বড়ো এবং 'হামাস' নামটি এসেছে আরবি ভাষায় ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত রূপ থেকে। হামাসের আবির্ভাব হয়েছিল ১৯৮৭ সালে, ইজরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্যালেস্তাইনি বিদ্রোহ বা প্রথম ইন্তিফাদার মাধ্যমে।

মৌলিক পার্থক্য : ফাতাহ ইজরায়েল দেশের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয় এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নম্বর প্রস্তাবনার পক্ষে সম্মতি জানায়। অন্যদিকে

হামাস ইজরায়েল দেশকে স্বীকৃতি দেয় না। বরং এই সশস্ত্র গোষ্ঠীটি তাদের ১৯৮৮ সালের প্রতিষ্ঠা সনদে বর্তমান ইজরায়েল-সহ প্যালেস্তাইনি অঞ্চলগুলি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া কথা ঘোষণা করেছে। ২০১৭ সালে স্বাক্ষরিত একটি নতুন নথিতে তারা ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের আগে বিদ্যমান সীমানাকে প্যালেস্তাইনি দেশের ভিত্তি হিসেবে স্বীকার করে। যেখানে জেরুজালেম হবে রাজধানী। দুটি রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য একটি একক প্যালেস্তাইন দেশ গঠন। কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই ভিন্ন। ফাতাহ, কখনও কখনও আল-ফাতাহ নামে পরিচিত, প্যালেস্তাইনি কর্তৃপক্ষের (পিএ) এই বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতা হলেন, মাহমুদ আব্বাস। তিনি প্যালেস্তাইনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি।

ফাতাহ নিজেদের একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। এজন্য তারা ইজরায়েলিদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে সেইসঙ্গে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে অংশ নিতে পারে। যেখানে কিনা হামাস প্যালেস্তাইনি অঞ্চলে ইজরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এবং একটি ইসলামিক দেশ গঠনের জন্য সশস্ত্র পথ বেছে নিয়েছে। কিছু পর্যবেক্ষকও মনে করেন, হামাস এবং ফাতাহ'র মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থেকে ইজরায়েল উপকৃত হচ্ছে। এমনকী এর মাধ্যমে তারা নিজেদের 'শত্রুকে দুর্বল' করতে উৎসাহিত হচ্ছে।

অন্যদের ধারণা, প্যালেস্তাইনের এই দুই দলের বৈরিতার মূল কারণ হলো নেতৃত্বের সংঘাত। মিডল ইস্ট ইন্সটিটিউটের (এমইআই) গবেষক ও পলিসির ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্রায়ান কাটুলিস বলেছেন, 'বৈরিতা হলো ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়।' তাঁর মতে, 'এর সঙ্গে আদর্শগত পার্থক্য থাকার কোনো সম্পর্ক নেই। এটি মূলত দুই দলের নেতাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। যারা নিজেদের অঞ্চলে সমর্থন আদায় করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়।'

এক কথায় বৈরিতা মানেই হলো 'অর্থ ও অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে রয়েছে', এটাই মূলত ক্ষমতার মূল ভিত্তি। কাটুলিসের মতে, উভয় দলেরই গ্রহণযোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে যা তাদের কর্মকাণ্ডে গভীরভাবে প্রভাব ফেলছে। এই কারণেই ফাতাহ ও হামাসের মধ্যে ফাটল ক্রমশ বাড়ছে। এই দ্বন্দ্ব প্যালেস্তাইনের স্বার্থকে প্রভাবিত করছে। কারণ এটি 'অভিজাতদের মধ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব।' তিনি জানান। 'তারা অনেক জনপ্রিয় সমর্থন হারিয়েছে, কারণ কোনো দলই দীর্ঘমেয়াদি সমাধান আনতে পারেনি'।

প্যালেস্তাইনিদের মধ্যে হতাশা

১৯৪৮ সালে ইজরায়েল দেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৭৫ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। প্যালেস্তাইনিদের একটা বড়ো অংশ এই দেখে হতাশ যে তারা তাদের প্রত্যাশা এখনও অর্জন করতে পারেনি, না কূটনৈতিক উপায়ে না সশস্ত্র উপায়ে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, এই অচলাবস্থার কারণে হামাস তাদের সশস্ত্র আক্রমণের মাধ্যমে মানুষের ব্যাপক সমর্থন আদায় করতে পেরেছিল, অন্তত গাজায় তারা অনেক সমর্থন পায়। বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে হাজার হাজার মানুষ হতাহত হওয়ার আগে পর্যন্ত হামাস এই সমর্থন পেয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠেছে, ৮৭ বছর বয়সি মাহমুদ আব্বাস প্রায় ২০ বছর ধরে প্যালেস্তাইনি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালন করে আসছেন, এখন তার স্থলে পশ্চিম তীরের শীর্ষ নেতৃত্বে কে আসবেন? এটাও বলা যাচ্ছে না, গাজায় ইজরায়েলের সঙ্গে বর্তমান সংঘাতের অবসান হলে হামাস নেতাদের কী হবে?

অথবা নতুন পরিস্থিতির আলোকে পশ্চিমতীর এবং গাজা উপত্যকার তরুণ প্যালেস্তাইনিরা ভবিষ্যতে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে তাও অজানা। আপাতত, ইজরায়েলে হামাসের আকস্মিক হামলার পর থেকে সেখানকার রাজনীতি সবচেয়ে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে রয়েছে। □

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের জেলা সংযোজক অনিমেশ গুঁইয়ের পিতা শঙ্করপ্রসাদ গুঁই গত ৫ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

বীরভূম জেলার নলহাটির দেশনবগ্রামের স্বয়ংসেবক তথা পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের পূর্ণকালীন কার্যকর্তা প্রবোধ মণ্ডলের মাতৃদেবী বিমলা মণ্ডল গত ৩০ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি ২ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মালদা নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক প্রাক্তন প্রচারক, প্রাক্তন মালদা জেলার কার্যবাহ কঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

* * *

দক্ষিণ বীরভূম জেলার নানুর খণ্ডের ব্যবস্থাপ্রমুখ রাজকুমার মণ্ডলের মাতৃদেবী গত ২৬ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

হুগলী জেলার পূর্বতন বৌদ্ধিক প্রমুখ দেবাশিস হালদারের মাতৃদেবী বিমল হালদার গত ৩০ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, গত ৯ নভেম্বর তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে তাঁর পুত্র সমাজসেবার জন্য শ্রদ্ধানিধি দান করেন।

* * *

কলকাতা মহানগরের উত্তরভাগ কার্যবাহ গৌর চট্টোপ্যাধ্যায়ের মাতৃদেবী শেফালি চট্টোপাধ্যায় গত ১৩ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

প্রোজেক্ট কুশ হতে চলেছে ভারতের নিজস্ব ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধী ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দুর্ধর্ষ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বা ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধী নিরাপত্তা ব্যবস্থা 'আয়রন ডোম' না থাকলে গত ৭ অক্টোবর থেকে হামাসের অতর্কিত একটানা ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত ইজরায়েল। ইজরায়েলের আয়রন ডোমের মতোই শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম তৈরি করতে চলেছে ভারত। পাকিস্তান এবং বিশেষ করে চীনের মোকাবিলায় ২০২৮-২৯ সালের মধ্যেই ভারত তার প্রথম স্বয়ম্ভর মিসাইল প্রতিরোধী ব্যবস্থা তৈরি করে ফেলতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতের নিজস্ব এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রোজেক্ট কুশ', যার দায়িত্বে রয়েছে ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও)। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয়ে গেলে, তা আকাশসীমায় কড়া নজরদারি চালিয়ে শত্রুপক্ষের দিক থেকে ধেয়ে আসা দূরপাল্লার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট, রাডারকে ফাঁকি দেওয়া স্টেল্থ যুদ্ধবিমান থেকে শুরু করে ড্রোন হামলা— সব কিছু ঠেকাতে সক্ষম হবে বলে ডিআরডিও-র বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী, প্রোজেক্ট কুশ সফল হলে ইজরায়েলের 'আয়রন ডোম' ছাড়াও ভারতকে দেওয়া রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'এস-ফোর হান্ড্রেড সিস্টেম' এবং আমেরিকার 'প্যাট্রিয়ট'-এর থেকেও তা বেশি কার্যকর হবে। কুশ প্রকল্পের অধীনে তৈরি সম্পূর্ণ ভাবে দেশীয় প্রযুক্তির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা লং রেঞ্জ সারফেস-টু-এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের (এলআরএস-এডিএস) মধ্যে রয়েছে আকাশে বহু দূর পর্যন্ত নজরদারি চালানোর ক্ষমতা, ১৫০ থেকে ৩৫০ কিলোমিটার দূরে থাকা ক্ষেপণাস্ত্রকে চিহ্নিত করে তা ধ্বংস করতে সক্ষম এল আর এস-এডিএস। এলআরএস- এডিএসে থাকছে ফায়ার কন্ট্রোল রাডারও। ডিআরডিও জানিয়েছে, কৌশলগত ভাবেও কাজ করতে সক্ষম হবে ভারতীয় 'কুশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম'। একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ভারতের দিকে ছোঁড়া হলে সেগুলি ধ্বংস করার ক্ষমতা থাকবে প্রায় ৯০ শতাংশ। দেশের মাটিতে শত্রুপক্ষের রকেট আছড়ে পড়ার আগে আকাশেই সেই লক্ষ্যবস্তুকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে এলআরএস-এডিএস। মাটি থেকে আকাশ— দূরপাল্লার হামলা প্রতিরোধী এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মূলত তিনটি কাজ করবে। এক, রাডারের মাধ্যমে লক্ষ্যবস্তু চিহ্নিত করা; দুই, দ্রুত সেই লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত বানার জন্য তৎপর হওয়া, এবং তিন, ক্ষেপণাস্ত্র হামলা রুখে দেওয়া।

গুগল ম্যাপে ইন্ডিয়া এখন ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের নাম ইন্ডিয়া থাকবে না ভারত হবে, এই বিতর্কের মধ্যেই গুগল ম্যাপে দেখা যাচ্ছে 'ভারত' নামটি। যদি কেউ গুগল ম্যাপের সার্চ বক্সে ইন্ডিয়া টাইপ করেন, তাহলে তেরঙা পতাকা দেখা যাবে। যার ওপরে লেখা রয়েছে 'ভারত, এ কান্ট্রি ইন সাউথ এশিয়া'। গুগল ম্যাপে হিন্দি কিংবা ইংরাজিতে ইন্ডিয়া লিখলে গুগল ফলাফল হিসেবে শুধুমাত্র ভারত দেখাবে। অর্থাৎ গুগল ম্যাপ ইন্ডিয়া ও ভারত উভয়কেই দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ফলে কোনও ব্যবহারকারী যদি গুগল ম্যাপে ভারতের সরকারি মানচিত্র দেখতে চান, তবে তাঁরা ইংরাজিতে বা হিন্দিতে গুগল ম্যাপে ইন্ডিয়া বা ভারত লিখে তা করতে পারেন। তবে এই ব্যাপারে গুগলের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। শিগগিরই এই ব্যাপারে গুগলের তরফে বিবৃতি দেওয়া হতে পারে।